KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

...d No KLMLGK 2007	Place of Publication আর্য পাবলিশিং হাউস ৪৩ নং স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা
Collection KLMLGK	Publisher জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
Title বিক্রমের পুরস্কার	Size 4.5"x7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol & Number ৩	Year of Publication ১৩২৮
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

নিরুপমা-পুরস্কার

(তৃতীয়-বর্ষ)

সন ১৩২৮ সাল

Published by
Jitendra Nath Banerji
Proprietor
SHARMA BANERJI & Co.
43, Simla Road,
Calcutta.

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

গল্পের নাম।		পৃষ্ঠা।
১। অলক্ষণা	..	
২। সোণার চিরুণী	...	২২
৩। ভূলীর প্রসাধন	...	৩৬
৪। চশমার চালাকি	...	৪৯
৫। প্রতিঘাত	...	৫৮
৬। হরিষে বিষাদ	...	৭১
৭। ভাইফোঁটা	...	৮১
৮। নিরুপমার জন্মকথা	...	৮৬
৯। রাবণের চিতা	...	৯১
১০। একটী গোলাপের কথা	...	১০৩
১১। বহ্বারম্ভে	...	১১৩
১২। ছদ্মবেশী	...	১২২

বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের এই নবীন উদ্যমে একটী বিষম আঘাত লাগিয়াছে—আমার পরম স্নেহাস্পদ তৃতীয় ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ আমাদের শোকসাগরে ভাসাইয়া পরমপিতার শ্রীচরণ লাভ করিয়াছেন। নিরুপমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, সকলই তাঁহার চেষ্টার ফল, সুতরাং তাঁহার অভাব যে বিশেষ রূপেই আমরা অনুভব করিব তাহা বলাই বাহুল্য। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক—আমাদের বলিবার কিছু নাই।

মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া ধরামাঝে শান্তি ঘোষিত হইয়াছে, তথাপি দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—এ বৃদ্ধির যে শেষ কোথা ও কবে, তাহা অনুমানেরও অতীত; সুতরাং হয় ত বাধ্য হইয়া নিরুপমার মূল্য কিছু বাড়াইতে হইবে। আশা করি নিরুপমার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণ অযথা ক্ষুব্ধ হইবেন না—কারণ তৈল আমরা কোন কারণেই নিকৃষ্ট করিব না—তৈলের বরং উত্তরোত্তর উন্নতি সংসাধিত হইবে। অন্যান্য তৈল প্রস্তুতকারিগণ ইতিপূর্ব্বেই কেহ দুইবার কেহবা তিন বার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অথচ অনেক তৈলই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে। এই মহার্ঘ্যতার দিনে অযথা বা অধিক লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয় হইবে না। আশা করি নিরুপমার সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ নিরুপমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহের চক্ষে দেখিবেন এবং তৈলে কোনরূপ ত্রুটী পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিঃসঙ্কোচে জানাইবেন—কারণ আমরা নিরুপমাকে আপনাদের মনের মতই করিতে চাই; কতকগুলি ফাঁকা প্রশংসাপত্রের মালা পরাইয়া তাহাকে ভূয়া সাজে সাজাইতে চাহি না।

কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩২৬

নিবেদক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।

—০:০:০—

পরম স্নেহাস্পদ

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় স্মৃতি

স্নিগ্ধ, শুভ্র, চিরোজ্জ্বল

রাখিবার জন্য

তৃতীয় বর্ষের

নিরুপমা পুরস্কার

উৎসর্গীকৃত

হইল।

সন ১৩২৭ সালের

নিরুপমা পুরস্কার।

(চতুর্থ-বর্ষ)

ব্যানার্জ্জির উপমাহীন কেশ-তৈল "নিরুপমার" সামান্য বিজ্ঞাপন উল্লেখে রচিত করুণ অথবা হাস্যরস প্রধান ক্ষুদ্র গল্প ও কবিতা রচনার জন্য এই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

নবীন সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহিত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক ও সুরুচিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক, কোনরূপ বিদেশী গল্পের অনুবাদ বা অন্য রচিত গল্পের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ না হয়। রচনা সাধারণ চিঠির কাগজের ১০।১২ পৃষ্ঠার অধিক না হয়। পরিষ্কার হস্ত-লিপি ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা আবশ্যক।

পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন, তবে পুরুষরচিত গল্প স্ত্রীলোকের নামে প্রেরিত হইয়াছে এইরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে উহা পুরস্কারের অযোগ্য বিবেচিত হইবে। একজন একের অধিক রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একের অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

রচনা আগামী চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক। প্রত্যেক রচনার প্রাপ্তিস্বীকার অসম্ভব। রচনা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠানই নিরাপদ। অমনোনীত রচনা কোনরূপে ব্যবহৃত হইবে না বা ফেরত দেওয়া হইবে না, সুতরাং নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম যথাসময়ে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। এসম্বন্ধে কাহারও সহিত কোনরূপ পত্র ব্যবহার করিতে আমরা অনিচ্ছুক।

মনোনীত রচনা আগামী ৺পূজার সময় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া "নিরুপমার" গ্রাহকবর্গ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।

পুরস্কার মুদ্রা বিচারকের ইচ্ছানুযায়ী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। তবে কোন পুরস্কৃত ব্যক্তি ২৫৲ টাকার বেশী বা ৫৲ টাকার কম পাইবেন না। বিচারকের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও গল্পের নাম পরিবর্ত্তন করা যাইবে; তজ্জন্য কাহাকেও কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে না।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—নিরুপমা তৈলের একমাত্র এজেণ্টস্ :—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

নিরুপমা-পুরস্কার প্রার্থিগণের

রচনাকালীন নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য
করিলে উহা অনেকটা আদর্শের অনুরূপ হইতে পারে :—

(১) রচনাটী যেন সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব হয়, ক
অপহরণের জন্য কেহ পুরস্কার দিতে পারে না।

(২) রচনা যত ছোট ও ভাবপূর্ণ হইবে ততই ভাল।
অনর্থক বর্ণনা করিয়া কাগজ ভরাইবার আবশ্যক না

(৩) রচনা সহজ (free) ও তাহার মধ্যে যে কো
তরঙ্গায়িত গতি থাকা চাই—কষ্টকল্পনা করিয়া যাহ
তাহা পাঠাইবেন না।

(৪) ভাষা মার্জ্জিত ও সুরুচির পরিচায়ক হওয়া চাই
কাহারও মনে কোনরূপে কুভাবের উদ্রেক না
ভাই বোনে একসঙ্গে পড়িতে পারেন এমন গল্প আম

(৫) ঘটনা নূতন না হইলেও চলে কিন্তু পুরাতনকে
এমন নবীনত্ব দান করিতে হইবে, যাহাতে উহ
আগ্রহের অভাব না হয়।

(৬) যে কোন রস অবলম্বনেই রচিত হউক না কে
সঙ্গে সঙ্গে ঐ রসের বিকাশ হওয়া চাই—অর্থাৎ গ
উহার ভাবের একটা ঝঙ্কার যেন পাঠকের প্রাণে বা

(৭) রচনায় বিজ্ঞাপন প্রয়োগকালীন একটু মস্তিষ্ক ব্যয়
এমন সামান্য ভাবে বিজ্ঞাপন দিবেন যাহাতে বিজ্ঞা
উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান না হয় অথচ তৈলের নামটী গ
সঙ্গে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই কৌশলের জন্যই পু
প্রবর্ত্তন।

নিরুপমা-পুরস্কার।

(তৃতীয় বর্ষ।)

প্রথম পুরস্কার ২০৲ টাকা।

অলক্ষণা।

(১)

সংসারে এক রকমের লোক আছে—যাহারা বড় ভাববিরল অথচ ভাবপ্রবণ! তাহাদের মনে একটা ভাব প্রবেশ কর্ত্তে অনেক দেরী লাগে; কিন্তু যখন করে, তখন তার উচ্চতম সীমায় ওঠে। অপ্রকাশ বাবুর মেয়ে অপর্ণাও ঠিক্ সেই রকমের। তার বৌ-দিদি সুহাস ছাড়া সেই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটীকে ঠিক্ বুঝিতে কেহই সমর্থ হয় নাই।

তাই যখন ও পাড়ার নির্ম্মল বাবুর ছেলেটার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক্ হয়ে গেল তখন অপ্রকাশবাবু তাঁর পুত্রবধূর কাছে ব'লেছিলেন "দেখ বৌমা, বিয়ের তো স্থির ক'চ্ছি, কিন্তু মেয়েটার মতি গতি দেখে আমার বড় ভয় হয়। ও যে মেয়ে, এক কাণ্ড না করে বসে।"

সুহাস সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; বলিয়
"বাবা, আপনার সব বিষয়েই একটু অতিরিক্ত সন্দেহ হয়।
তেমন মেয়ে নয়।" অপ্রকাশবাবু কিন্তু সে কথায় বিশে
পান নাই।

যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। অপর্ণার তী
চাহনী তাহার শাশুড়ীর মোটেই ভাল লাগে নাই। তিনি
বাবুকে বলিলেন "হ্যাগা, বৌমার নজর যে বড় খ'রা
ও মেয়ে পছন্দ ক'র্ল্লে কি ব'লে?"

নির্ম্মলবাবু হাসিয়া বলিলেন "আগে আমি মনে ক
আমাকেই চস্‌মা নিতে হয়, এখন দেখ্‌ছি তোমার জন্যও
চস্‌মা কেনা দরকার। বৌমার চোখ একটু উজ্জ্বল বটে
খ'রা নয়।"

নির্ম্মল বাবুর গৃহিণীর বিশ্বাস যে তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত।
এই উপহাসে তিনি বেশ একটু রাগত হইলেন; বলিলেন,
তো ছাই জানো। মেয়েটাকে দেখেই আমার একটু সন্দ হ
যাহা হউক, কথাটা আপাততঃ এই খানেই চাপা পড়িয়া গে

ফলকথা অপর্ণার চাহনী বড় তীব্র ছিল। সে চ
সকলকেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হইত। তাই আমাদের
চারিচক্ষুর ক্ষণিক মিলনে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ফুল-শয্যার রাত্রে অরুণ যখন ঘরে আসিল তখন অপর্ণ
দেহ সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুই
অরুণ সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ডাকিল—"অপর্ণা!"

অপর্ণা উঠিয়া বসিল; সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কি আমায় ডাক্‌লে?"

অরুণ তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ, তুমি দুটো কথা কবে না?"

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। তাহার তীব্র দৃষ্টি অরুণের মুখে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ক্রমে দ্রবীভূত হইয়া উঠিল। তাহার প্রশস্ত চোখদুটী জলে ভরিয়া গেল।

অরুণ তাহার চোখ মুছাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই সে চট্ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। অরুণ আবার ডাকিল—"অপর্ণা!"

অপর্ণা পাশ না ফিরিয়াই বলিল—"কেন?"

অরুণ বলিল—"তুমি কি কথা কবে না!"

অপর্ণা বলিল—"কাল।"

অরুণ বলিল—"কেন? আজ দোষ কি?"

অপর্ণা কিন্তু একটা ছোট "না" বলিয়াই নিরস্ত হইল। এবং অনেক ডাকাডাকিতে তাহার আর কথা কহিবার সম্ভাবনা দেখা গেল না।

অরুণও একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে একটু রুক্ষ কণ্ঠে ডাকিল "অপর্ণা!"

অপর্ণা জীবনে কখনও রুক্ষস্বর শোনে নাই; সে চকিতে উঠিয়া বসিল, তীব্র দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অরুণ তাহার আকুল

প্রণয়োচ্ছ্বাস, অনন্ত বাসনা, দলিত-সাধ লইয়া
লুটাইয়া পড়িল।

বারান্দায় দু'চারিটী রসিকা আড়ি পাতিয়াছি
এই আশাতীত অভিনয়ে এমন আত্মবিস্মৃত হই
অপর্ণার সহসা বারান্দায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা প্র
পারেন নাই; তাই সকলেই ধরা পড়িয়া গিয়াছি
বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের লক্ষ্যও করিল না; রেলিং ধ
রহিল।

বিভা যখন দেখিল যে তাহাদের আড়ি পাত
উপক্রম হইয়াছে, তখন সে অপর্ণার নিকট আসিয়া বলি
উঠে এলে কেন? শোওগে যাও।"

অপর্ণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিভা
ধরিতেই সে সবলে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইল।
"বৌদি, তুমি বড় দুষ্টু তো! আচ্ছা দেখি তু
যাও। আমি মাকে বলে দিতে যাচ্ছি।" চরণাল
ঝঙ্কনায় নৈশ নীরবতাকে গঞ্জনা দিয়া বিভা চলিয়া গে

অরুণ এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল, কিন্তু বাহিরের অ
ধ্বনি তাহার কাণে যাইতেই সে বাহিরে আসিয়া ডাকিল

বিভা ফিরিয়া আসিল। অরুণ বলিল—"তোরা
ক'চ্ছিস্?"

বিভা এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল। অরুণ
মাকে কিছু বলিস্ নি।"

বিভা তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত চলিয়া গেল। অরুণ অপর্ণার পাশে দাঁড়াইয়া মিনতির স্বরে বলিল—

"অপর্ণা শোবে চল, আর তোমাকে বিরক্ত কর্ব্ব না।"

অপর্ণা ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পররাত্রে অরুণ যখন খাইতে বসিয়াছিল তখন তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁরে অরুণ, কাল বৌমা যে এই কাণ্ডটা কর্ল্লে, তুই আমাকে জানাতে বারণ করেছিলি কেন?"

অরুণ এই অতর্কিত আক্রমণে এত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে সব জানিয়া শুনিয়াও জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"কি কাণ্ড মা?"

অরুণের মাতা বলিলেন—

"কি কাণ্ড! সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড। কাল বৌমা অত লোকের সাম্‌নে ঐ কাণ্ডটা কর্ল্লে, তুই কিনা চুপ করে রইলি? ছি ছি ছি! পাড়া শুদ্ধ লোকে যা-ইচ্ছে তাই বল্‌ছে, আর আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। কথায় বলে বোবার শত্রু নাই, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইল না। অরুণের এই নিস্তব্ধতা তাহাকে তাহার স্ত্রীর একান্ত বশীভূত প্রমাণ করিয়া তাহার মাতাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি তাহার পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে নানা প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অরুণ নীরবে তাহার আহার সম্পূর্ণ করিয়া উঠিয়া গেল।

অপর্ণা তখন রান্নাঘরে বসিয়া বাঁ'হাতে তাহার আঁচলে
বাহির করিতেছিল। তাহার শাশুড়ী ঘরে প্রবেশ
ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ বাছা, তুমি ভাল ক
বলে দিচ্ছি। ও সব নবাবী, সাহেবী চাল এখানে চল
তোমার জন্য আমরা পাড়ার লোকের কাছে কোন ম
হেঁট কর্ত্তে পারবো না। আর যদি সাম্‌লে না চল,
আমি তোমার মুখ দেখ্‌ব না; আবার আমার ছেলের বিয়ে
যাও অরুণের খাওয়া হয়েছে, পান দাওগে যাও।"

অরুণ আপনার শয়নকক্ষে বসিয়াছিল। অপর্ণা ঝড়ে
ঘরে ঢুকিয়া পানের ডিবা বিছানার উপর রাখিয়া বলিয়া উ

"আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

অরুণ বলিল—"অপর্ণা আমার কথা শোন। একটু
হও। ছেলেমানুষী সব সময়ে সাজে না।"

অপর্ণা বলিল—"ছেলেমানুষী আবার কি? আমি
থাকবো না।"

অরুণ বলিল—"অপর্ণা তুমি এখনও ছেলেমানুষটী নেই।
সুঝে চল। মেয়ে মানুষকে তার শ্বশুর বাড়ীতেই চি
থাক্‌তে হয়, সেই তার ঘর। স্থির হও, বাপের বাড়ী যাবে বৈ

অপর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে নতজানু হইয়া বসি

"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে পাঠিয়ে দাও। এখানে থ
আমি কখনও বাঁচবো না। ওগো, পাঠিয়ে দাও আমাকে, এ
আমি থাক্‌তে পারবো না।"

অপর্ণা বোধ হয় কথাগুলি একটু জোরেই বলিয়া ফেলিয়াছিল। আর কি কারণে ঠিক্ বলা যায় না তাহার শাশুড়ীও সেই সময়ে বারান্দাতেই ছিলেন। কথাগুলি তাঁহার কাণে যাইতেই তাঁহার গা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "থাক্‌তে পারবে না তো দূর হয়ে যাও!"

অরুণ অপর্ণাকে তুলিতে যাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণাও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতেছিল।

তাহার শাশুড়ী বলিলেন—"আমি তখনই বলেছিলুম যে ও "অলক্ষণা" মেয়েকে আনা ভাল হয় নি। তাতো কেউ শুন্‌লে না! সব রূপ দেখেই জ্ঞান হারালেন! অলক্ষণা ঐ রূপেই এ বাড়ীর সর্ব্বনাশ কর্‌বে।" অপর্ণার প্রতি একটা আন্তরিক বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অপর্ণার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সাঁ করিয়া সরিয়া গেল। চঞ্চল রক্তস্রোত যেন উদ্দাম বেগে তাহার বুকের মধ্যে ছটোপুটি করিতে লাগিল। যেন শত শত অলক্ষ্য স্বর তাহার কাণের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—"অলক্ষণা! অলক্ষণা!!" চক্ষের সম্মুখে যেন শত বজ্রাগ্নির আলোক জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া দিল, তাহার পর সব অন্ধকার!

অপর্ণা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল; অরুণ ছুটিয়া আসিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিল—"অপর্ণা! অপর্ণা!!"

(২)

প্রায় ছয়মাস পরে একদিন বিকালবেলা অপর্ণা য
ফুল তুলিতে ব্যস্ত ছিল, তখন সুহাস আসিয়া বলিল,—

"অপর্ণা! অরুণ এসেছে, আয় তোকে সাজিয়ে দি

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল—"এর আবার সাজগোজ
বৌদিদি, আমি নাচের পুতুলের মতন সেজেগুজে
দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। কোথা যেতে হবে চল।

সুহাস বলিল—"তুই ভাই বড় একগুয়ে। অ
দেখিস্, ছুটো ভাল কথা কস্;—ঝগড়া করিস্ নে যেন

অপর্ণা নীরবে তাহার সহিত চলিয়া গেল।
অরুণ একটি ঘরে বসিয়া ছাতের দিকে একমনে চাহিয়া
খুব সহজভাবে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সব ভাল

অরুণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ছয় মাস পরে স্বামী
প্রথম সম্বোধন! সে যাহা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি
অধিকাংশ ভুলিয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অর্পণা তাহার এই অভাবনীয় নীরবতায় আশ্চর্য্য হ
জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর সব ভাল তো?"

অরুণ মৃদুস্বরে কি একটা বলিল তাহা ভাল বুঝা
তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—

"অপর্ণা, এতদিন তোমায় দেখতে আসতে পারিনি
মনে কর না, আমি বড় ব্যস্ত ছিলুম তাই আসতে পারি
তোমার জন্যে ছুটো জিনিষ এনেছি, নিলে বড় সুখী হব।

অপর্ণা নীরব। সে অরুণের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। অরুণ উৎসাহিত হইয়া ছুইটী চামড়া বাঁধান সুদৃশ্য ছোট ছোট বাক্স বাহির করিয়া তাহাদের ডালা খুলিয়া ফেলিল। অর্পণা দেখিল একটীতে একজোড়া হীরকখচিত ব্রেসলেট, অপরটীতে একশিশি গোলাপগন্ধ "নিরুপমা।" অরুণ একে একে অপর্ণার হাত ছু'খানি ধরিয়া এক এক গাছি ব্রেসলেট পরাইয়া দিল। তাহার পর চিত্রকর তাহার মানস-সুন্দরীর চিত্রাঙ্কন করিয়া যেমন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, কিংবা প্রতিমানির্ম্মাতা যেমন তাহার মনোমত প্রতিমা গড়িয়া স্থিরদৃষ্টি হইয়া দেখে, অরুণও সেইভাবে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। অরুণের, মুগ্ধভাব দেখিয়া অর্পণার বড় হাসি পাইতেছিল।

অরুণ অর্পণার হাত ছাড়িয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—

"অপর্ণা, তুমি আমার চিঠির জবাব দাও নি কেন? লজ্জা কি?"

অর্পণা চুপ করিয়া রহিল। অরুণ তাহার উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগে হৃদয়ের ভাব নানা ছন্দে ভাষাবিপর্য্যস্ত করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার জীবনের কত আশা, কত ভাব! সে আজ অপর্ণার উপর তাহার ভালবাসা অর্পণ করিয়া সার্থক করিতে চলিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিতে লাগিল। অর্পণা কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু বর্ণনাচ্ছটা অরুণের প্রেমগুঞ্জনের মৃদু উচ্ছ্বাসে গুমরিয়া গুমরিয়া তাহার কাণে বাজিতেছিল। সে যদিও বুঝিতে পারিতেছিল না তবুও দূরাগত বংশীধ্বনির মত মিষ্ট লাগিতেছিল। সেও মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ তাহারা এইভাবে বসিয়াছিল। অরুণ উঠিয়া বলিল,—

"অপর্ণা, আজ তবে আসি। আবার কবে আসব ঠি
পারি না।"

অপর্ণা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

অরুণ বলিল—"বাবার বড় অসুখ!"

অপর্ণা চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবার অসুখ! কেম
তিনি?"

অরুণ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ভাল নয়। কখন কি হয় ি
যায় না। অর্পণা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এ

অপর্ণা বলিল—"আমার যেতে মত আছে কি
আমি এখনই—"

অরুণ বলিল—"না। অর্পণা, আমি জান্‌তে এসেছি তু
ভালবাস কি না। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে আসি নি।

রাগে অপর্ণার সর্ব্বশরীর জলিয়া উঠিল। সে একটু উ
বলিল,—

"বেশ সময় পেয়েছ কিন্তু। বাবার অবস্থা এই কখন
তার স্থিরতা নেই আর তুমি এতক্ষণ বাজে সময় নষ্ট করে
জিজ্ঞাসা কচ্ছ, ভালবাসি কি না?"

রাগে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্রেসলেট
তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আছাড়িয়া ফেলিয়
বিক্ষিপ্ত হীরকময় অলঙ্কার হইতে শত জ্যোতি বিচ্ছুরিত
অপরাহ্নের প্রায়ান্ধকার গৃহখানিকে ঝলসিয়া দিল।
বলিল,—

"এই নাও তোমার উপহার! যে এত হীন তার উপহার আমি
নিতে চাই না, আর এত হীন যে, তাকে আমি ভালও বাসি না!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অপর্ণা থামিয়া গেল। অরুণের মুখ
যেন মরার মত শাদা হইয়া গিয়াছে। অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অরুণও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে
উপেক্ষিত উপহার দুটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে অপর্ণার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল।
সে জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুহাস দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া তীব্রকণ্ঠে ডাকিল—"অপর্ণা!"

অপর্ণা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। সুহাস তীব্রস্বরে বলিল—
সর্ব্বনাশী! তুমি একেবারে উচ্ছন্ন গেছ?"

"কেন বৌদি?"

"কেন? অরুণকে অমন অপমান করে তাড়ালি কেন?"

"শ্বশুরের অসুখ—"

"তাকি অরুণ জানে না! সে কি কম আকর্ষণে কর্ত্তব্যের
অবহেলা করে ছুটে এসেছিল; আর তুই তার সেই কোমল
মনটাকে তোর উপেক্ষার পদাঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে
ফেল্লি! কি কল্লি অপর্ণা কি কল্লি?"

অপর্ণা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুহাস উচ্ছ্বাসে বলিতে
লাগিল,—

"অপর্ণা! তুই বাঙ্গালীর মেয়ে, তোর অন্তঃকরণ এত
কঠিন কেন? একি মেয়ে মানুষের মন? যখন পুরুষ মানুষ সংসা-

রের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসবে
নারী তার পূর্ণ প্রীতিধারায় তাকে স্নিগ্ধ করে দেবে। ত
যত স্নেহ যত মমতা আছে সে সবার স্নিগ্ধ প্রলেপে সেই স
জুড়িয়ে দেবে। তার প্রত্যেক কাজে মানুষ উৎসাহিত, অনু
হয়ে উঠবে। মেয়ে মানুষ শুধু কর্ত্তব্যের পথে যেয়ে পুরুষ ম
উৎসাহিত কর্ব্বে। আর তার স্বামীর সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে
তুই বাঙ্গালীর মেয়ে, তুইও তোর স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে
যা। দেখ তাতে কত সুখ।"

অপর্ণা চুপ করিয়াই রহিল। সুহাস বলিল,—"দেখ্
ভাবি, ঐ যে বোসেদের বৌটি বিধবা হয়েছে ও কি ক'রে অ
ভগবান্ না করুন-আমি হ'লে কিন্তু কখনই বাঁচতুম না।" ল
অরুণিমা সুহাসের মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল "অপর্ণা, এ বি
হেলায় হারাস্ নি। এখন অহঙ্কারে তুই তার অপমান
শেষে তুই কাঁদবি। স্বামী স্ত্রী কি ভিন্ন! তুই আজ অরুণের অপ
করিস্ নি; নিজেরই অপমান করেছিস্।" সুহাস চলিয়া গে
অপর্ণা অশ্রুনিবদ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। একটি ধূসর যবনিকা
দিগন্তরেখার সান্ধ্য রক্তাভার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িতেছি
অপর্ণার অশ্রুনির্ঝর আর তাহার কঠোর শাসন মানিল
অবাধে বহিল। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়ি
যে ভাব সে কখনও চিনিতে পারে নাই, সেই ভাব আজ দি
লোকের মত তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে শয্যায় লুটাই

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"ওগো শুনে যাও, শুনে
যাও,—আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে কত ভালবাসি!"

(৩)

অরুণের বাপ মারা গিয়াছেন। পিতৃশোক এবং অপর্ণার প্রত্যাখ্যান তাহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিয়াছে। তাই সে সকল অপমান, অভাব, জ্বালা-যন্ত্রণার বিস্মৃতির জন্য মদ ধরিয়াছে। যখন মদ খায় তখন সব ভুলিয়া এক রকম বেশ থাকে। আবার যখন নেশা কাটিয়া যায়, তখন আবার পূর্ব্ব স্মৃতি মনে হয়, আবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে মদ খায়। এমনি করিয়া দু'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অপর্ণাকে আনিবার কথা বলিলে অরুণ রাগে জ্বলিয়া ওঠে, আনিতে নিষেধ করে। তাহার কথায় যখন অপর্ণার আসা স্থগিত হয়, তখন আবার একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা তাহার মনে কাঁটার মত ফুটিতে থাকে।

অরুণ মধ্যে মধ্যে লিভারে ব্যথা বলে। ডাক্তার তাহাকে মদ খাইতে বারণ করিয়াছিল কিন্তু সে শোনে নাই। সে স্থির করিয়াছিল যে, যদি সে অতীতের স্মৃতির তীব্র কশাঘাত মদ খাইয়া জুড়াইতে পারে, তবে তাহাতে যতই ক্ষতি হউক না কেন, সে তাহা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এক একবার ভাবে যে সে অমন দুর্মুহূর্ত্তে অপর্ণাকে কেন উপহার দিতে গিয়াছিল, তাহার কৈফিয়ত না লইয়া কেন অপর্ণা তাহাকে অপমান করিল। একবার ভাবে যে সে সব বুঝাইয়া বলিয়া আসে, আবার ভাবে যে তাহার এত দায় কিসের? অপর্ণা কি সাধিয়া আসিতে পারে না? কিন্তু

অপর্ণা দাসীকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল-
চিঠি পত্র কি এনেছিস্ দে।"

দাসী অবাক্ হইয়া রহিল, বলিল—"তোমার তো
নেই বৌদি!"

অপর্ণা বিশ্বাস করিল না, বলিল—"নিশ্চয় আছে,
দেখ্।"

দাসী বলিল—"না বৌদি, থাক্‌লে তোমায় দিতুম্ না

অপর্ণা হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমা
যেতে বলেছেন?"

"না।"

অপ্রকাশবাবু যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, তখ
পিছন হইতে ডাকিল। অপ্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়ে
বলিল "বাবা, আমিও যাব।"

অপ্রকাশবাবু বলিলেন—"কৈ, তাঁরা তো তোমাকে
যেতে বলেন নি!"

অপর্ণা বলিল—"তা না বলুন। আমার সেখানে য
আবার কার মতের দরকার?"

অপ্রকাশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সেটা কিছু দিন
বুঝলে ভাল হ'ত। এখন যাওয়া হ'তে পারে না।"

অন্য সময় হইলে অপর্ণা কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিত
আজ সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তাহার শ্বশুরবাড়ীর দাসী তখনও ছিল। তাহাকে

ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"তুই যা এক খানা গাড়ী ডেকে আন
দিকি। আমি যাব।"

দাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কোথা?"

অপর্ণা বলিল—"তোদের বাড়ী।" দাসী গাড়ী আনিতে গেল।

অরুণ শয্যায় শুইয়াছিল, তাহার অবস্থা সঙ্কট। তাহার হৃৎপিণ্ড
থাকিয়া থাকিয়া সজোরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মদ খাইলে একটু
কম পড়ে, আবার যখন তাহার প্রতিক্রিয়া হয় তখন আবার
সেই দ্রুতস্পন্দন। ডাক্তার বাবু মদ নিষেধ করিয়া একটি ঔষধের
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঔষধ দেখিয়া অরুণ চীৎকার করিয়া
বলিল "অষুধ খাব না, মদ দাও।" ঔষধের গ্লাস ছিনাইয়া লইয়া
মেঝেতে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিয়া বলিল "মদ দাও, নইলে
বাঁচবো না।"

ডাক্তার বাবু আর একটু ঔষধ ঢালিয়া "বলিলেন যেমন ক'রে
হ'ক একটু খাওয়াতেই হবে, নইলে হার্ট ফেল করবে।"

অরুণ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"কখন অষুধ খাব না। দাও,
মদ দাও।"

ডাক্তার বাবু চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"তাইতো, কে ওষুধ
খাওয়ায়?"

অপর্ণা সহজ গতিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"আমাকে দিন,
আমি খাইয়ে দিচ্চি।"

অপর্ণা ঔষধ লইয়া অরুণের নিকট গিয়া মৃদু আদেশের সুরে
বলিল—"অষুধ খাও।"

অরুণ নত মস্তকে বসিয়াছিল, সে বিস্মিতের মত ম
তুলিল। তাহার মুখ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে বাহির হই
"অপর্ণা !!"

অপর্ণা বলিল—"হাঁ আমি অপর্ণা—অষুধ খাও।"

এ মৃদু কঠোর অদেশ আমান্য করিতে অরুণ পারিল না। ঔষধ পান করিয়া শুইয়া পড়িল। অপর্ণা গেলাস রাখিয়া হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইভাবে দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে। অরুণ কখনও থাকে আবার কখনও বা চঞ্চল হইয়া উঠে। তবে অপর্ণা অ অবধি তাহার ঔষধ খাওয়া নিয়মিত রূপে হইতেছে।

একদিন রাত্রিশেষে অরুণ চক্ষু চাহিয়া ডাকিল—"অপর্ণা

অপর্ণা সোফায় বসিয়া কিছু ভাবিতেছিল; উঠিয়া অ পাশে দাঁড়াইল।

অরুণ বলিল—"অপর্ণা আমি বোধ হয় আর না। আমার মনে যে কটা কথা অনবরত জাগছে, তার দাও।"

অপর্ণা একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া বলিল—

"তুমি ওসব কথা বল্‌ছ কেন? অসুখ কি আর কা না? তুমি সেরে উঠবে। এখন একটু ঘুমোও।"

অরুণ কাসিয়া বলিল—"অপর্ণা, আমি বেশ বুঝতে পা আমি আর বাঁচবো না। আমি যা শুন্‌তে চাই বল।"

অপর্ণা নীরবে রহিল। বোধ হইতেছিল সে তাহার কান্না চাপিবার প্রয়াস পাইতেছিল। অরুণ বলিল,—

"অপর্ণা, তুমি আমার যা সেবা যত্ন কচ্ছ তা দেখলে বোধ হয় না যে তুমি আমাকে ভালবাস না। কিন্তু"—বলিয়া একটু চুপ করিল। আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু তুমি আমাকে দুবছর আগে যা বলেছিলে, আজ তাই বা মিথ্যা বলি কি ক'রে! আমি নিজের কাণে যা শুনেছি তাই বা অবিশ্বাস করি কি করে? আমি একথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তুম না। কিন্তু মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে আর সন্দেহ চেপে রাখতে পার্‌ছি না।"

অপর্ণা নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণ সংশয় উত্তেজনায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—

"বলবে না অপর্ণা! চিরকাল আমাকে সংশয়ে রেখে এসেছ, আজও রাখবে? শেষ মুহূর্ত্তেও আমার সন্দেহ দূর কর্ব্বে না?"

অপর্ণা সচকিতে উঠিয়া অরুণকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিতে দিতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"আমি বলবো ওগো সব বলবো। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

অরুণ শুইয়া পড়িয়া বলিল—"বল তুমি কেন আমার উপহার উপেক্ষা ক'রে আমাকে সে কথা বলেছিলে?"

অপর্ণা নম্রকণ্ঠে বলিল—"তুমি আমার আকর্ষণে কর্ত্তব্য অবহেলা করে ছুটে গিয়ে ছিলে বলেই আমার নিজের ওপর আর তামার কাজের ওপর আমার ঘৃণা হয়। তাই সে সময়ে ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"তাহ'লে সে কথা মিথ্যা ?"

অপর্ণা নীরবে রহিল।

"তাহ'লে তুমি আমায় ভালবাসো ?"

অপর্ণা আগেকার মতই চুপ করিয়া রহিল, শুধু ি

শ্রু তাহার চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অরুণ

"তবে কি একটা ভুলের বশে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে

তদিন না বুঝে তোমাকেও ভাসিয়ে দেবার উদ্যোগ

পর্ণা তুমি যদি আজ সে উপহারগুলি ফিরে পাও তা

হণ কর ?"

অপর্ণা রুদ্ধরোদন-কণ্ঠে বলিল—

"হাঁ, করি। এতদিন তোমার মনে কষ্ট দিয়ে যে প

এসেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করি।"

অরুণ বলিল—"তুমি নাও, সত্যি নাও!! অপর্ণা

তোমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছি তার জন্যে ক্ষমা কর্ব্বে।"

আবার অপর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে

"তোমার দোষ কি ? আমি নিজেই তার সূচনা ক

অরুণ—"বলিল। অপর্ণা, আমার হাতবাক্সে সেগুলি

চাবি নাও। এগুলি কারুকে দিও না—আমার স্মৃতিচিহ্ন, য

অপর্ণা নীরবে চাবিটি লইল। অরুণ একটু পরে

"অপর্ণা, আজ আমার আবার বাঁচিতে সাধ হ'চ্ছে।

কিন্তু আরও দুদিন আগে এলে না কেন ? তাহ'লে বু

এমন ভাবে যেতে হত না। অপর্ণা!—"

অপর্ণা অগ্রসর হইয়া অরুণের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল :—
অরুণের প্রসারিত বাহুদ্বয় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিল। অপর্ণা
যেন কিসের আকর্ষণে আরও একটু নত হইয়া পড়িল। অরুণের
বাতনা কম্পিত অধর অপর্ণার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। অপর্ণা চক্ষু
মুদ্রিত করিল। অরুণ তাহার স্তিমিত জীবনের শেষ সমস্ত-প্রয়াসে
তাহার স্ত্রীর অধর হইতে প্রথম ও শেষ চুম্বন গ্রহণ করিল।
তাহার পর তাহার অবশ হস্ত দুটি খসিয়া পড়িল। অপর্ণা সচকিতে
চাহিয়া দেখিল যেন অরুণের চক্ষুতারার উপর দুইটি স্বচ্ছ
যবনিকার মত আবরণ নীচের দিক্ হইতে ধীরে ধীরে উঠিতেছে।

অপর্ণা বাণাহতের মত উঠিয়া টলিতে টলিতে মেঝেতে লুটাইয়া
পড়িল।

শ্রীকালীভূষণ ঘোষ।
১২৭, লুকার গঞ্জ,
এলাহাবাদ।

দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫৲ টাকা।

সোনার চিরুণী।

—০:*:০—

(১)

শীতের এক সন্ধ্যায় জ্যোতিশ বাবুর বাসায় নি
কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া গল্প করিতেছিলেন। বা
বাতাস বহিতেছিল—দোর জানালা সব বন্ধ থাকি
বেশ একটু কন্‌কনে শীত অনুভূত হইতেছিল।

এমন সময়ে দাবা খেলা যাইতে পারে কিনা,
খেলিতে কিরূপ হয়, এই লইয়া যখন মতভেদ হইতে
জ্যোতিশ বাবু বলিলেন "খেলা রেখে গল্প শুনুন—আমি
এক ঘটনায় পড়িয়াছিলাম যে, সে কথা মনে হলে অ
হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।"

অমূল্যবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"এমন কি গল্প ভায়
চেয়েও বড় হইল ?"

জ্যোতিশ বাবু বলিলেন, "সে কথা আর বল্‌বে
বিপদে যেন ভগবান্ কাউকে না ফেলেন। সে যে
একেবারে গিয়াছিলাম আর কি !!"

"তবে গল্পই হউক—তবে গল্পই হউক"—বলিয়া স
বাবুর প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন।

রাগ্ খানা ভাল করে গায়ে জড়াইয়া একটু সরিয়া বসিয়া জ্যোতিশবাবু সুরু করিলেন, "তবে শুনুন—

অমূল্যবাবু এই অবসরে তাঁহার সোণার চশমাখানি চামড়া দিয়া ঘসিয়া নাকে পরিয়া লইলেন। শ্যামাপদবাবু তাঁহার রৌপ্যনির্ম্মিত সিগার কেস হইতে একটী শর্ম্মা বানার্জ্জির মিঠে-কড়া মৌলমিন চুরুট বাহির করিয়া জ্বালাইয়া লইলেন। ধীরেনবাবু ওভার কোটের বোতাম আঁটিয়া সম্মুখস্থ চেয়ারে গিয়া বসিলেন। সুরেন বাবু টেবিলের উপরে আলোটী একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিলেন, "Let it be ready also."

একরাশ ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া শ্যামাপদবাবু বলিলেন, "আরম্ভ করুন জ্যোতিশবাবু, আপনার গল্প—দেখিবেন, Mutton chop বলে যেন শেষটা একেবারে Chicken broth না হয়ে পড়ে।

"Truth is better than fiction" এই বলিয়া জ্যোতিশবাবু আরম্ভ করিলেন, "সে আজ সাত বৎসরের কথা—আমি তখন কৃষ্ণনগরে প্রথম চাকুরিতে ঢুকি। সেবার অনেক করিয়া পূজার সময় একমাসের ছুটী লই। বন্ধুবর হরিহর ভায়া তখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত। ভায়ার সেবার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বর্ত্তমান Etiquette অনুসারে তিনি তখন বিবাহ করিবেন না বলিয়া বাড়ীর সকলের নিকট বড় জেদ করিতেছিলেন। ছুটীর সময় বাড়ী গেলে একটা যা'তা' রকমের ব্যাপার হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় ভায়া সেবার ছুটীটা মেসেই কাটাইতে-ছিলেন।

আমি বাড়ী আসিলাম। কথা হইল ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বেড়াইয়া আসিব। হরিহর ভায়ার উঠিয়া তাহাকেও একটু বুঝাইয়া আসিব। ভায়াকে হইবে যে, আজকালকার দিনে মৎস্যের তৈল দ্বারা মৎস্য করিতে পারিলে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য অর্থা তিনি বিবাহ দ্বারা যৌতুক প্রভৃতি রূপে যে অর্থোপার্জ্জন তদ্দ্বারা তাঁহার বিবাহযোগ্যা কনিষ্ঠা ভগ্নীকে অক্লেশে করা যাইতে পারে। এই নীতি অতিশয় সুন্দর এবং থাকিলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই ইহা অবলম্বন করা উচিত।

তার পর, যে দিন কলিকাতায় রওয়ানা হইব, তার আগে আমার এক আত্মীয় তাঁহার মেয়ের মাথার এক সোণার চিরুণী এবং কয়েকটী টাকা আমার হাতে দিয়া ব "কলিকাতা হইতে এই চিরুণী খানা ভাঙ্গাইয়া কয়েক পাথর বসাইয়া নূতন করিয়া গড়াইয়া আনিবে।"

আমি তখনই সেই চিরুণী খানা এক খানি কাগজ দি করিয়া জড়াইয়া রাখিলাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অদৃষ্ট জড়াইয়া গেল তাহা কি করিয়া বুঝিব!

তিন দিন পর আমি কলিকাতায় রওয়ানা হইলাম।

(২)

কলিকাতায় আসিয়া হরিহর ভায়ার ওখানে উঠিলাম দিন ভোরের বেলা এক জন খ্যাতনামা মণিকারের

চিরুণীখানা ভাঙ্গিয়া গড়াইবার জন্য দিয়া আসিলাম। বিকেলবেলা আবার সেই মণিকারের দোকান হইয়া একটু বায়ু সেবনের অভি-প্রায়ে গড়েরমাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে মাঠের ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় চাহিয়া দেখি, একব্যক্তি দূর হইতে যেন আমাকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন। ক্রমে সেই ব্যক্তি আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তার পর আমার নিকটে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

আমি আমার নাম বলিলাম। আমার নাম শুনিয়াই তিনি যেন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। পরক্ষণেই সে ভাবটী সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীর ভাবে আমাকে বলিলেন, "আমার সহিত আপনাকে একটু যাইতে হইবে।"

আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি প্রয়োজন তাহা খুলিয়া বলুন।"

আমার প্রশ্নে সে ব্যক্তি যেন বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিলাম। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "বহুবাজারে এক মণি-কারের দোকানে আপনি একখানি সোণার চিরুণী ভাঙ্গিতে দিয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত সেই দোকানে আপনাকে যাইতে হইবে।"

চিরুণীর কথায় আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "হাঁ আমি এক খানি সোণার চিরুণী ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দিয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না।"

আগন্তুক বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন, "কি হইয়াছে না হইয়াছে এখন বলিতে পারি না। তবে ইন্‌স্পেক্টার বাবুর হুকুমে আপনাকে সেই খানে লইয়া যাইতেছি।"

ক্রমে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা দেখিলাম। নিতান্ত বিস্মিত হইলেও ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। সুতরাং আর বেশী বাকাব্যয় না করিয়া আগন্তুকের সহিত চলিলাম।

আগন্তুক রাস্তার ধারে আসিয়া আমাকে একখানি মোটর গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। আমি যেন মন্ত্রচালিতের ন্যায় সেই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছাড়িয়া দিল; মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা গিয়া সেই মণিকারের দোকানে উপস্থিত হইলাম।

(৩)

মণিকারের দোকানে প্রবেশ করিয়াই দেখি, সেখানে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী অপেক্ষা করিতেছেন। আমি সেখানে প্রবেশ করিবামাত্র আমার কি নাম—কোথায় থাকি—কোন্ জায়গা-হইতে আসিতেছি প্রভৃতি কয়েকটী কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইলেন। তার পর দোকানের মালিককে তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তিই কি আপনাকে চিরুণী দিয়াছিল?" মণিকার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি আমার সেই চিরুণী খানি হাতে লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই চিরুণী কি আপনার?"

আমি উত্তর করিলাম, "চিরুণী আমার নয়। উহা আমার এক আত্মীয়ের। ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়াইবার জন্য অদ্যই ভোরে এই দোকানে দিয়া গিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল মৌন ভাবে থাকিয়া, পুলিশ কর্ম্মচারী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই চিরুণী খানি চোরাই মাল। আপনি যাহার নিকট হইতে ইহা আনিয়াছেন, তাহাকে ধরাইয়া দিতে না পারিলে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। কেহ আপনার জন্য জামিন না হইলে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

কথাটা শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শুধু মনে হইল, ঘুমের ঘোরে যেন এক খানা স্বপ্ন দেখিতেছি! উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী দুইজন আমাকে থানায় লইয়া যাইবার জন্য যখন গাড়ীতে তুলিলেন, তখন আমি নিজের অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। ক্রোধে অপমানে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল দুইজনকে সজোরে ভূতলশায়ী করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাই। কিন্তু নিরুপায় হইয়া অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

(৪)

অমূল্য বাবুর চক্ষুটা এই সময় কট্‌কট্ করিতেছিল, কাজেই তিনি চশমা খুলিয়া একবার চক্ষুটা তৎপর চশমাটা ভাল করিয়া

ঘসিয়া লইলেন। শ্যামাপদ বাবু বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তিনি রজতাধার হইতে আর একটা চুরুট লইয়া উহা ধ্বংসের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর বাবুকে খবর পাঠাবার চেষ্টা করিলেন না?" জ্যোতিশ বাবু বলিলেন, "তার আর সময় পাইলাম কোথায়!"

"তার পর থানায় লইয়া গিয়া দুইজন কনেষ্টবল আমার হাত ধরিয়া নীচে নামাইল। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম নিয়তি-চক্রে আমার অদৃষ্টে শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হইল।

সেই মণিকার প্রকৃতই বড় ভাল লোক ছিলেন। আমাকে এইরূপ বিপদে পড়িতে দেখিয়া তিনি হরিহরকে সংবাদ প্রেরণ করেন। হরিহরও তাহার অপরিচিত ছিল না। সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র হরিহর গাড়ী করিয়া থানায় ছুটিয়া আসিল।

তাহাকে দেখিয়া আমি খুব আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু সে আমার মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই করিতে পারিল না। বিশেষতঃ রাত্রিতে আমার জামিনের ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হইল না।

পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া হরিহর নিতান্ত হা হুতাশ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তাহার পর আমাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল। নিজের অদৃষ্টকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে সেই অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিলাম।

ঘরের মাঝখানে একটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। অন্ধকারে লোকটাকে ঠাহর করিতে পারিলাম না। সেদিক দিয়া

যাইতেই একেবারে হুড়মুড় করিয়া তার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলাম। সে তখন "ক্যায়সা অন্ধা হ্যায়" বলে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে, দুই চার জন কনেষ্টবল তখনি সেদিকে ছুটিয়া আসিল। পোড়া অদৃষ্ট! আমার বেয়াদবির কথা তৎক্ষণাৎ বড় বাবুর নিকট রিপোর্ট হইল—আসামী হাজত ঘরে বেজায় হল্লা আরম্ভ করিয়াছে, অতএব তাহার হিল্লা করা অত্যাবশ্যক।

বড় বাবুর হুকুম হইল আসামীকে হাতকড়া লাগাইয়া রাখা হউক।

আমি মেঝের উপর পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম নিজের অদৃষ্টের কথা আর সেই অলক্ষণে সোণার চিরুণীর কথা!

আঙ্গুলের মৃদু মৃদু আঘাতে পোড়া চুরুটের অগ্রভাগের ছাই ফেলিতে ফেলিতে শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "সোণার চিরুণী না হউক, সোণার কাঁটার কথা অনেকেরই চিন্তার বিষয় বটে! তবে এক্ষেত্রে তফাৎ এই যা তার সঙ্গে ছিল আপনার পুলিশের লোকদের তিক্ত কঠোর বদনমণ্ডলের মহাধ্যান!

জ্যোতিশ বাবু বলিলেন, "ধ্যান বলে ধ্যান সে সাঙ্ঘাতিক রকমের ধ্যান। আপনারা যাহাকে সিদ্ধি বলেন তাই। একেবারে সারা বিশ্বময় সেই একমাত্র সশ্মশ্রু বদনমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি। চক্ষু মুদিলেও তাই—চক্ষু মেলিলেও তাই।"

(৫)

"অতি কষ্টে সেই রাত্রি প্রভাত হইল। উষার স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া আমার ঘরে আসিয়া পড়িতেছিল। দারুণ চিন্তায় সমস্ত রাত্রিতে আমি এক নিমিষের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সেই অন্ধকারময় গৃহে আমার যেন তখন প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। দারুণ উৎকণ্ঠায় আমি হরিহরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় ১০টার সময় হরিহর থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ মণ্ডল অতিশয় শুষ্ক দেখিয়াই বুঝিলাম সে আমার জন্য কিছুই করিতে পারে নাই। কার্য্যেও তাহাই হইল—হরিহর প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আজ কোর্ট বন্ধ থাকায় এত চেষ্টা করিয়াও তোমার জন্য কিছু করিতে পারিলাম না। তোমার বাড়ীতে জরুরী তার পাঠাইয়াছি। আর তুমি যদি বল এখনি তোমাদের বাড়ীতেও যাইতে পারি।"

হরিহরকে আমাদের বাড়ী যাইবারই পরামর্শ দিলাম। হরিহর তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেল।

আশার যে ক্ষীণ আলোক রেখাটুকু ছিল তাহাও এখন নির্ব্বাপিত হইল।

হরিহর চলিয়া গেলে আমি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি এমন সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে জানাইয়া গেলেন যে, তদন্তে নাকি প্রকাশ পাইয়াছে, উক্ত চিরুণী কোনও ব্যক্তি

আমাকে দেয় নাই। যাঁহার নিকট হইতে চিরুণী আনিয়াছিলাম বলিয়া আমি বলিয়াছি তিনি এখন চিরুণীর কথা অস্বীকার করিতেছেন!

এতক্ষণ যে সাহসটুকু ছিল এখন তাহাও অন্তর্হিত হইল। অদৃষ্টবিপর্য্যয়ে যাঁহার চিরুণী তিনিও এখন অস্বীকার করেন! কি ভীষণ কথা ?

(৬)

হরিহর বাড়ী যাইয়া দেখিল বাস্তবিকই যে আত্মীয়টী আমাকে চিরুণী দিয়াছিলেন তিনি এখন এই গোলমাল দেখিয়া লোকের পরামর্শে চিরুণীর কথা অস্বীকার করাই স্থির করিয়াছেন। হরিহর বে-গতিক দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় আসিয়াই আমাকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, যেরূপেই হউক সেই-দিন সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে খালাস করিয়া লইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া ফেলিল। অনেক যুক্তি তর্কের পর স্থির হইল যে, গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য লইয়া চিরুণীর মালিক যে, প্রকৃতই আমাকে উহা ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

এদিকে আমি সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। "I can not agree to this my friend"—এই বলিয়া গুম্ফাগ্রভাগ সূচের মত করিতে করিতে সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তারপর—"

"তারপর"—জ্যোতিশবাবু বলিতে লাগিলেন "আমি যে আশা

করিতেছিলাম, কি ভাগ্যে যেন তাহাই ফলবতী হইল। সন্ধ্যার সময় হরিহর আমাকে জামিনে খালাস করিয়া লইয়া গেল। বাহিরের উন্মুক্ত হওয়ায় আমি যেন হাপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দুই দিন সেই অন্ধকারময় গৃহে থাকায় সারা জগৎ যেন আমার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যে পর্য্যন্ত না গোয়েন্দার রিপোর্ট বাহির হয় সে পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতুবি রহিল। কলিকাতা না থাকিলে মোকদ্দমার তদ্বির হয় না, কাজেই আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কি অশান্তিতে যে দিনগুলি কাটিতে লাগিল তাহা আর প্রকাশ করিতে পারিব না। এদিকে ছুটীও প্রায় ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। ইতি মধ্যে একবার বাড়ী গিয়া সেই আত্মীয়টীকে চিরুণীর কথা স্বীকার করাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ৩০।৪০ টাকার একখানি চিরুণীর মায়া ত্যাগ করা বরং ভাল তবু এমন ফ্যাসাদে পা দিতে নাই।

অগত্যা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিতান্ত উদ্বেগে তদন্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

(৭)

প্রায় কুড়িদিন পর গোয়েন্দার রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। তাহাতে এরূপ লেখা ছিল :—

(ক) জ্যোতিশবাবু যে চিরুণীখানা মণিকারের দোকানে ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে এবং পরীক্ষা দ্বারা

সপ্রমাণ হইয়াছে যে দোকানে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ১৫ দিনের মধ্যে উহা আর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ঐ চিরুণীর অনুরূপ যে চিরুণীখানা এই ঘটনার তিনদিন পূর্ব্বে চুরি গিয়াছিল, চোর তাহা ব্যবহারকারিণীর মস্তক হইতেই খুলিয়া লইয়াছিল। অতএব এই চিরুণী সেই চোরাই মাল হইলে, ইহাতে সদ্যঃ ব্যবহারের চিহ্ন থাকিত। (খ) জ্যোতিশবাবুর চিরুণী পক্ষকাল অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলেও উহাতে একটি কেশতৈলের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। বিশেষ অনুসন্ধান এবং রাসায়ণিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত গন্ধ ব্যানার্জ্জির উপমাবিহীন কেশতৈল মধুমালতী-গন্ধ 'নিরুপমা'র। তৎপর বিশেষ তদন্তের ফলে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, উক্ত চিরুণী-ব্যবহারকারিণী ঠিক একপক্ষকাল পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের 'নিরুপমা' তৈলে প্রসাধন-পূর্ব্বক এক বিবাহ-বাটীতে গিয়াছিলেন। যে 'নিরুপমা' উক্ত মহিলা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার অবশিষ্টাংশও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারাও উক্ত নিরুপমার গন্ধে এবং চিরুণীর গন্ধে কোন প্রভেদ পাওয়া যায় নাই। যে চিরুণী চুরি গিয়াছে তাহার ব্যবহারকারিণী অন্য প্রকার কেশতৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে গন্ধ অতিশয় ক্ষণস্থায়ী বলিয়া পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব চোরাই চিরুণীতে এরূপ সুগন্ধ থাকা সম্ভব নহে।

(গ) আর একটী বিশেষ কথা এই যে, জ্যোতিশ বাবুর চিরুণীর একপাশে ব্যবহারকারিণীর 'বনলতা' নামের আদ্যক্ষর

একটি 'ব' লেখা আছে। চোরাই চিরুণীতে সেরূপ কোন চিহ্ন আছে বলিয়া প্রকাশ নাই।

(ঘ) যেরূপ কৌশলে তদন্ত করা হইয়াছিল তাহাতে জ্যোতিশ বাবুর আত্মীয়ের চিরুণী নিজস্ব বলিয়া অস্বীকার করিবার কোনই উপায় ছিল না। তিনি চিরুণী নিজস্ব বলিয়া নিদর্শন পত্রও দিয়াছেন।

(ঙ) অতএব এই চিরুণী যে জ্যোতিশবাবু তাঁহার আত্মীয়ের জন্যই ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট হইতেই আনিয়াছিলেন ইহাতে আর কোও সন্দেহ নাই। সুতরাং জ্যোতিশ বাবু নির্দ্দোষ; এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হইতে পারে না। চিরুণীও জ্যোতিশবাবু অথবা উহার মালিককে ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে।

(৮)

যে দিন এই রিপোর্ট প্রকাশ হইল সে দিনকার মনের ভাব প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। আমার মান সম্ভ্রম এমন কি চাকুরীটি পর্য্যন্ত এই সঙ্গে চিরকালের জন্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দয়াময় ভগবান্ গোয়েন্দারূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলেন;—আমি সসম্মানে মুক্তি পাইলাম।

সেই চিরুণী আমি আর স্পর্শ করিলাম না। মালিকের নিকট উহা পৌঁছিয়া দিতে পুলিসকেই অনুরোধ করিলাম। টাকা কয়েকটিও মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিলাম।

যে "নিরুপমা" আমার তদন্তের এত বড় সহয়তা করিল, তাহা এক শিশি খরিদ করিয়া লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী রওয়ানা হইলাম এবং এইখানেই—

"আমার কথাটি ফুরাল
ন'টে গাছটি মুড়াল।"

এমন সময় এক দীর্ঘ শিখাধারী খোট্টা বামুন আসিয়া জ্যোতিশ বাবুকে বলিল "বাবুজি, ভাল্‌সা হো গিয়ি। মাইজী আপ্‌লোককো বোলাতী হায়—"

সুরেন্দ্রবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। অতএব সকলেই তৎপর হউন।" শ্যামাপদবাবু দেহতত্ত্বের আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহার গলায় কম্ফর্টার জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "জ্যোতিশ বাবুর গল্পটা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শুনা গিয়াছে। অত্যধিক মনোযোগ প্রদানে মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া হয়। সুতরাং কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্কের বলাধান জন্য সুখাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। অতএব এখন আমাদের গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভোজনে প্রবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বলা বাহুল্য, কেহই এ উপদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন।
কাপ্তাই
পোঃ আঃ চন্দ্রঘোণা।
চট্টগ্রাম।

তৃতীয় পুরস্কার (ক)—১০৲ টাকা।

ভুলীর প্রসাধন।

(১)

সে দিন রবিবার, ছুটীর দিন। সুরবালা সকাল হইতেই মনে মনে একটা কথা তোলাপাড়া করিতেছিল কিন্তু স্বামীকে তাহা বলিবার সুযোগ পাইতেছিল না। চা প্রস্তুত হইলে চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের রেকাবি লইয়া বাহিরের ঘরে স্বামীর টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল। তাহার পর যখন দেখিল স্বামীর চা-পান শেষ হইয়াছে তখন ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সকাল বেলা এক পেয়ালা চা পেটে পড়িলে পুরুষ মানুষের মেজাজটা কিরূপ বদলাইয়া যায় সুরবালার তাহা ভাল রকম জানা ছিল, তাই সে এবার নিঃসঙ্কোচে স্বামীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। শৈলেন বাবু তখন চুরুট ধরাইয়া খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"কি, ব্যাপার কি ?"

সুরবালা নিকটস্থ একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল—"বল্‌ছিলুম কি, আজ ত তোমার ছুটী, মাসী মাকে ক'দিন দেখ্‌তে

যাওয়া হয়নি, কেমন আছেন তাও জানি না, একবার সঙ্গে করে যদি দেখিয়ে আনো——"

শৈলেন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"দেখ্‌তে যাওয়া ত দরকার কিন্তু তা'র যে কোন সুবিধা দেখ্‌চি না। আজও আমাকে একবার আপিসে যেতে হবে,—সাল্‌তামামীর সময়, একটু কাজের ভিড় পড়েচে।"

সুরবালা বলিল,—"বেশ ত, আজ যেতে একটু বেলা হলে ত কোন ক্ষতি নেই। আর মাসীমার বাড়ীও তোমার আপিসে যা'বার পথে,—আমাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে অম্‌নি চলে যেতে পার ত।"

এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথা না পাইয়া শৈলেন্দ্র বলিলেন,—"হাঁ, তা, তা হ'তে পারে বই কি ; কিন্তু ছেলেপুলে—সঙ্গে করে রোগী দেখ্‌তে যাওয়া ত ভাল নয়, আর তা'দের বাড়ীতে রেখে গিয়েও নিশ্চিন্ত হ'বার জো নেই। তা'র কি উপায় করবে ? যে সব দুরন্ত,—আজও আবার একটা কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাক্‌বে !"

শৈলেনবাবু একটু বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, ভাবিলেন এ দুরূহ সমস্যার সমাধান করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। তিনি জানিতেন না যে পুরুষ মানুষ, বাহিরে কল কারখানা চালাইতে পারে, সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারে, কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গৃহরাজ্য,—যেখানে নারীরই একাধিপত্য, তাহা কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত শাসিত হয় তাহা পুরুষের

বুদ্ধির সীমাতীত। স্বামীর কথায় সুরবালা দমিল না, হাসিয়া উত্তর করিল,—"তোমার আর কোন আপত্তি থাকে ত বল, ছেলেদের বন্দোবস্ত আমি কর্‌বো, তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

সুরবালা তখন পুত্র-কন্যার জন্য যে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। শৈলেন বাবু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন,—"আচ্ছা বেশ, দেখা যা'ক, ছেলে মেয়ে তোমার কেমন বাধ্য, তোমাকে কেমন ভালবাসে। তোমার যে রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখ্‌চি, বড়লাটের পদ খালি হ'লে তোমায় বা ধরে নিয়ে যায়!"

সুরবালা হাসিয়া উত্তর করিল,—"মন্দ কি, তা হ'লে একবার দেখেনি তোমার রাজ্যটা কি করে শাসন হয়!"

সুরবালা বাটীর ভিতর আসিয়া পুত্র-কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আপন শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। ছেলের নাম সুধীর,—বয়স আট বৎসর; মেয়ের নাম সুশীলা,—বয়স ছয় বৎসর। ভাই বোন দুটীর গুণ তাহাদের নামের অনুরূপ, তাহাদের জননীর এইরূপই বিশ্বাস, কিন্তু পিতা প্রত্যহ বৈকালে আপিস হইতে আসিয়া একটা না একটা অপকর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া কথাটা এখন আর আদৌ বিশ্বাস করেন না। সুরবালা আজ তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিল,—"তোমাদের সেই সেজ দিদিমণি,—সেদিন যাঁকে আমরা দেখ্‌তে গেছ্‌লুম, আজও একবার দেখ্‌তে যাব। তোমাদের সেখানে গিয়ে কাজ নেই, কি বল?

অন্ধকার ঘরের ভিতর চুপ করে বসে থাকা সে কি তোমাদের ভাল লাগে, তার চেয়ে তোমরা বাড়ীতেই থাক। মোক্ষদা থাকবে, সে তোমাদের খাবার-টাবার দেবে। দুটী ভাই বোনে মিলে খেলা-দেলা করো। আর সুধীরের নূতন ছবির বই এসেচে ত, তা'তে ভারি মজার মজার সব গল্প আছে, সুশীলাকে পড়ে শুনিও। তোমরা যদি বেশ লক্ষ্মী হয়ে থাক তা' হ'লে বাবুকে বলে দিয়েচি আসবার সময় সুধীরের জন্যে একটা ভাল রবারের বল্‌ আর সুশীর পুঁতুলের জন্যে পুঁতির মালা আন্‌বেন, কেমন?"

দুজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে মায়ের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল এবং ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া প্রত্যেক কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিল। সুরবালা তাহাদের সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিল,—"আচ্ছা যাও, এখন তোমরা খেলা কর গিয়ে।"

(২)

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীর সকলের আহারাদি সারা হইলে সুরবালা কোলের ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর সহিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যাইবার সময় সুধীর ও সুশীলাকে আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল,—"বেশ মিলে মিশে খেলা ধুলা করো, আমরা যা'তে খুসী হই তাই করো।"

সুরবালা গাড়ীতে উঠিয়া দেখিল সুধীর ও সুশীলা উপরে

জানালায় দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া আছে। সে একবার স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিয়া উদ্দেশে তাহাদের প্রতি চুম্বন জানাইল। বালক-বালিকার মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সুধীর জানালার শিক ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, সুশীলা হাসিয়া হাত বাড়াইয়া যেন গাড়ীটাকে ধরিতে গেল। পর মুহূর্ত্তেই গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল। সুশীলা একটা অতি মৃদু দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীরের পক্ষে অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব, সে পড়িবার টেবিলের নিকট গিয়া বিক্ষিপ্ত বই শ্লেট এবং খাতাপত্র গুছাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিল।

গৃহিণী আজ মোক্ষদার উপর সংসারের ভার দিয়া গিয়াছেন, তাই সে আহারাদি শেষ করিয়া একবার চারিদিক্ পরিদর্শন করিতে বাহির হইল এবং ছেলেরা বেশ শান্ত শিষ্ট হইয়া আছে দেখিয়া গৃহের দ্বার হইতেই নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল। এইরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার আয়োজন করিল।

বই পত্র নাড়িতে নাড়িতে নূতন ছবির বইখানি হাতে পড়িতেই সুধীর বলিয়া উঠিল,—"ওরে সুশী, গল্প শুন্‌বি ত আয়। ভারি মজার গল্প আর ছবি আছে।" এই বলিয়া সে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বইখানি ভাল করিয়া টেবিলের উপর খুলিয়া ধরিল। সুশীলাও তাহার পার্শ্বে আর একখানা চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহে ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। সুধীর বলিল,—"এই দেখ্,

প্রথম গল্প হচ্চে 'বাঘের মাসী।' বাঘের মাসী কে বল্ দেখি, জানিস্ না? বেরাল! এই যে ছবিতে রয়েচে,—এইটে বাঘ, আর গাছের ওপর এইটে বেরাল।"

সুশীলা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"কই দেখি, এ মাগো! এই বুঝি বেরাল, ভারি ত! এর চেয়ে আমাদের ভুলী দেখ্‌তে ঢের সুন্দর, নয় দাদা?"

সুধীর অভিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"হুঁ, ভুলী ত আর দিশি বেরাল নয়, ও যে কাবুলী বেরাল।"

যাহার কথা হইতেছিল সে এই সময়ে নিজের নাম শুনিয়াই হউক কিংবা বাটীতে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এক লম্ফে টেবিলের উপর উঠিয়া বসিল। প্রকৃতই ভুলীর জন্মস্থান কাবুল। শৈলেন বাবুর কোন বন্ধু যুদ্ধের সময় চাকুরী উপলক্ষে কাবুলে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে দুটী বিড়াল-শাবক আনিয়া শৈলেন বাবুকে একটা দিয়াছিলেন। বিড়ালটি দেখিতে অতি সুন্দর, আপাদমস্তক তুষার-শুভ্র দীর্ঘ লোমে আচ্ছাদিত। ভুলী ছেলেদের খেলার সাথী, তাহাদের পিতা-মাতার স্নেহের আধার।

সুধীর অন্যমনস্ক ভাবে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"সুশী রে, বড় কথা মনে পড়েচে রে! ওঃ তা হ'লে কি মজাই হয়, দেখি দাঁড়াও।" এই বলিয়া সে প্রবল উত্তেজনায় নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া আপন মনে কি বকিতে লাগিল। সুশীলা মহা কৌতূহল-পূর্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ভ্রাতার

মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"কি দাদা, বল্‌বে না দাদা ?"

সুধীর বলিল,—"তোর মনে পড়ে বাবা মাকে একদিন কি বলেছিলেন ?"

সুশীলা ভাবিল এতো বড় বিপদ, কতদিন কত কথা হয়, তাহার মধ্যে কোন্ দিনের কোন্ কথাটা আজ দাদার এতটা চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বেচারি কেমন করিয়া জানিবে !

সুধীর বলিল,—"সেদিন বাবা বলেনি যে ভুলীর গায়ে পোকা ধরেচে, লোম আর বাড়্‌চে না, ঝরে পড়্‌চে ;—লোমগুলো এক্‌টু ছেঁটে সাবান দিয়ে গা ধুইয়ে দিলে সব ভাল হয়ে যাবে ?"

সুশীলা মাথা নাড়িয়া জানাইল—মনে পড়িয়াছে।

সুধীর আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"তা'রপর মা কতবার বাবাকে বলেচে, ভুলীর লোম ছেঁটে দিতে ; বাবা কেবলই বলেন সময় নেই।" সুশীলা আবার মাথা নাড়িল।

সুধীর বলিল,—"বাবার ত সময়ই হয় না ; আজ ছুটি ছিল, আজও হ'ল না। আমার আজ সময় আছে, আমিই করবো।"

সুশীলা ভয়ে ভয়ে বলিল,—"মা যদি বকে ?"

"হ্যাঁ, বক্‌বে ! বাবাকে বলেও হ'ল না, আমি যদি করি ভালই ত। বক্‌বে কেন, বরং খুসী হবে।"

দাদার সঙ্গে তর্ক করা যে কতদূর দুঃসাহসিক কার্য্য সুশীলা তাহা বেশ জানিত, তথাপি তাহার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন

করিতে পারিল না। মনের সন্দেহ টুকু তাহার মুখ দিয়া আপনিই প্রকাশ হইয়া গেল,—"তুমি পার্‌বে ?"

সুধীর ঘুসি পাকাইয়া চোক ঘুরাইয়া বলিল,—"কি ! পার্‌বো না, খুব পার্‌বো, নিশ্চয় পার্‌বো। মায়ের সেলাইয়ের বাক্স থেকে সেই বড় কাঁচিখানা আন্ না, দেখিয়ে দি পারি কি না। কিন্তু তোকে একটু ধর্‌তে হবে সুশী,—ভুলীটা ভারি দুষ্ট কিনা। পার্‌বি ত ?"

দাদা অত বড় কাজটা পারিবে আর সে এই সহজ কাজটুকু পারিবে না ? সে বড় লজ্জার কথা ! বলিল,—"পার্‌ব।"

"তবে দাঁড়া" বলিয়া সুধীর ছুটিয়া গিয়া বড় কাঁচিখানা আনিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইল। সুশীলা ভুলীকে কোলের উপর শোয়াইল, সুধীর মহা আড়ম্বরের সহিত কাঁচি চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইল। ভুলী কিছুতেই স্থির হইয়া থাকে না, সুশীলাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না ;—ফলে এখানে একগোছা সেখানে একগোছা লোম কাটা হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিস্তর বাদ রহিয়া গেল। তখন দুজনে পরামর্শ করিয়া ভুলীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য মোক্ষদার নিকট হইতে তাহাদের জলখাবারের দুবাটি দুধ আনিয়া ভুলীর সম্মুখে ধরিল, ভুলীও মহানন্দে দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিল। সুধীর সেই সুযোগে তাহার ঘাড়ের ও গলার বিস্তর লোম কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু মাথায় হাত দিতেই ভুলী ঘোর আপত্তি উপস্থিত করিল, কারণ তাহাতে তাহার দুগ্ধপানে বিঘ্ন ঘটে। আবার লাঙ্গুলের লোম কাটিতে

গেলে তাহা এত নড়িতে থাকে যে কিছুতেই ধরা যায় না। সুধীর তখন হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"মাথাটা আর লেজটা না হয় থাক!"

ভুলী ইতিমধ্যে আহার শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সুশীলাও ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন অজ্ঞাতসারে সুধীরেরও চক্ষু বুজিয়া আসিল।

গৃহিণী বাটীতে না থাকায় মোক্ষদারও সেদিন ঘুমের মাত্রাটা একটু বাড়িয়া গিয়াছিল, যখন ভাঙ্গিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ছেলেদের জলখাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই মেজের চারিদিকে গোছা গোছা সাদা লোম ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া প্রথমটা আঁৎকাইয়া উঠিল। এদিক্ ওদিক্ চাহিতেই নিদ্রিত ভুলীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও মা ভুলীটার একি দশা হয়েছে! সারাদিন ধরে বুঝি এই হচ্ছিল? তাই বলি এখন সব চুপচাপ কেন! আচ্ছা, বাবু আসুন না, আজ আর রক্ষা থাক্‌বে না!"

মোক্ষদার উচ্চ কণ্ঠস্বরে সুধীরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। মোক্ষদা চলিয়া গেলে সে উঠিয়া বিক্ষিপ্ত লোমগুলি কুড়াইয়া একখানা কাগজে মুড়িয়া রাখিয়া দিল, তাহার পর সুশীলাকে লইয়া জলযোগ করিতে বসিল। সুধীর বলিল,—"দেখ সুশী, আর একটা কাজ করতে হবে; —ভুলীকে এইবার ভাল করে নাইয়ে দিতে হবে, শীগ্‌গির খেয়ে নে।"

আহার শেষ করিয়া দুজনে ভুলীকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া জোর করিয়া গা ধুইয়া দিল। সুশীলার মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল—"দাদা, ভুলীকে একটু গন্ধ তেল মাখিয়ে দেবে?"

সুধীর বলিল,—"ঠিক বলেচিস্ রে; তেলের শিশিটা নিয়ে আয় না।"

সুশীলা ছুটিয়া গিয়া তাহার মায়ের অতি আদরের "নিরুপমা" তৈলের শিশি আনিয়া হাজির করিল, সুধীর খুব খানিকটা তৈল লইয়া ভুলীকে জব্‌জবে করিয়া মাখাইয়া দিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। মোক্ষদা ইতিপূর্ব্বেই ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। সুধীর সুশীলাকে লইয়া পড়িবার ঘরে গিয়া নূতন ছবির বই লইয়া পড়িতে বসিল এবং সুশীলা মন দিয়া সেই সব মজার মজার কথা শুনিতে লাগিল।

(৩)

সন্ধ্যার পর সুরবালা বাটী আসিল। উপরে উঠিতেই ভুলী কোথা হইতে আসিয়া তাহার পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। সহসা "নিরুপমা" তৈলের সুপরিচিত সুগন্ধ পাইয়া সুরবালা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এত গন্ধ ছাড়লো কেন রে, সুধীর বুঝি আমার তেলের শিশিটা ভেঙ্গেচে?"

মোক্ষদা বলিল, "না গো মা, সুধীর তোমার কি যে কাণ্ড করেচে—"

সুরবালা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল,—"কি হয়েচে? তা'রা

সব কোথা?" একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

মোক্ষদা তখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। শৈলেন-বাবুও ইতিমধ্যে উপরে আসিয়াছিলেন, মোক্ষদার মুখে ছেলের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া এবং ভুলীর অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া ভয়ানক চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সে কোথায় গেল, আজ রাস্কেলটাকে চাব্‌কে লাল কর্‌বো, নিত্যি একটা না একটা অকর্ম্ম করবে!"

সুরবালার কিন্তু বড় হাসি পাইতেছিল, সে স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল,—"ওগো তাকে মেরো না, বরং আমার উপর ভার দাও, আমি শাসন কর্‌চি; মারধর করে কি হবে!"

শৈলেন বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, বেশ, তোমার শাসনটাই দেখা যাক।"

সুরবালা পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিতেই সুধীর ও সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরবালা বলিল,—? "সুধীর, আজ কি করেছ বাবা, ভুলীটার যা চেহারা হয়েছে বাবু দেখে বড় রাগ কর্‌চেন।"

সুধীর অভিমানের সুরে কহিল,—"তুমিই ত বাবাকে বলেছিলে ভুলীর লোম কেটে দিতে; বাবা কিছুতেই কল্লেন না, তাইত করেচি।"

"কিন্তু তোমরা যে ছেলেমানুষ, তোমরা কি পার?"

"কেন পার্‌বো না, ঐ ত পেরেচি, ভাল হয় নি? ভুলীটা মা এত দুষ্ট, কিছুতেই গায়ে হাত দিতে দেবে না!"

সুরবালার বড় হাসি পাইতেছিল, অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি করে কর্‌লে?"

সুধীর তখন মহা উৎসাহের সহিত সমস্ত বর্ণনা করিয়া ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি ত রাগ করনি?"

সুরবালা বলিল,—"তা একটু করেছি বই কি! এত কষ্ট করে, নিজেদের সব দুধটা নষ্ট করে, এ কাজ কর্‌তে গেলে কেন?"

দারুণ অভিমানে সুধীরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া বলিল,—"তুমি খুসী হবে বলে।"

সুরবালা ছেলেকে সাদরে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—"ওরে পাগল ছেলে, মাকে খুসী কর্‌বে বলে এত কষ্ট করেচ, এতটা স্বার্থত্যাগ করেচ! কিন্তু খুসী কর্‌বো মনে কর্‌লেই কি খুসী করা যায়?"

সুশীলা ম্লান মুখে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিল,—"মা, তুমি কি আমার উপরও রাগ করেচ?"

সুরবালা তাহাকেও বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বলিল,—"না, আমি কারুর ওপর রাগ করিনি। মাকে খুসী কর্‌তে গিয়ে হাজার অন্যায় কর্‌লে, ভুল ভ্রান্তি হলে, আমি ত কোন্ ছার, যিনি জগতের রাজা তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন, তখন আমাদের রাগ কর্‌বার সাধ্য কি! আজ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি জীবনের প্রত্যেক কাজের ভিতর বাপ-মাকে সুখী কর্‌বার ইচ্ছাটা যেন চিরকাল সমান প্রবল থাকে।"

এইরূপে সব গোল চুকিয়া গেল,—কেবল কপাল ভাঙ্গিল

ভুলীর! লোম কাটিয়া তাহার যে বীভৎস আকার বাহির হইয়া- ছিল তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাই পাছে চোখে পড়িয়া যায় বলিয়া একটা ঘরে আবদ্ধ থাকে, কেহ আর তাহাকে আদর করে না। কেবল সুধীর ও সুশীলা এখন তাহার ব্যথার ব্যথী, কারণ তাহাদেরই দণ্ড বেচারী ভুলী নিজ স্কন্ধে বহন করিতেছে।

তাহার পর এই কয় মাস কাটিয়াগিয়াছে, ভুলী এখনও কারা- মুক্ত হইয়া স্নেহে আদরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা সে সংবাদ আজও পাই নাই।

শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী সেন
শ্রীরামপুর।

——

তৃতীয় পুরস্কার (খ)—১০৲ টাকা

চশমার চালাকি।

(A)

প্রভাত যেদিন ধপাস্ করিয়া আছাড় খাইয়া সিঁড়ির উপর ...তে পড়িল—যদিও সেদিন তাহার ভগ্নীপতি প্রকৃতিবাবু বেশ ...টুকু বিরক্ত হইয়াছিলেন—তবুও তৃতীয় পক্ষের পত্নী প্রমীলার ...নভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

প্রকৃতিবাবুর চাকরীটি ছিল Railway Police এ (রেলওয়ে ...শে)। কাজেই তিনি মাহিয়ানা ব্যতীত এ-দিক ও-দিক হইতে ...তেন প্রকারে বিলক্ষণ Two Pice have (টু পাইস হ্যাভ) ...তে পারিতেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রথমা পত্নীর পাণি- ...ন করেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাগ্যে মাষষ্ঠীর কৃপা না হইয়া ...বিবির অনুগ্রহ হয়। কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত ঘটনার ...উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয় পরিগ্রহ করেন।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে, যমরাজ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—তিনি ...কলসীটাকেই আগে খালি করেন; সুতরাং প্রকৃতিবাবু

সম্বন্ধেই বা একথাটি খটিবে না কেন? তাই তিনি প্রকৃতিবা
পত্নীর কলসী একবার থালি হইয়াছে দেখিয়া দ্বিতীয়বারও খা
করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের কথা ৪০ এর পূর্ব্বে বি-পত্নীক হই
পুনরায় বিবাহ করিতে হয়। বিশেষতঃ হিতৈষী বন্ধু বান্ধব আ
স্বজন সকলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মরণাশৌচের চতুর্দ্দশ দিবস প
প্রকৃতিপ্রকাশ প্রমীলার পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করি
বাধ্য হইলেন।

যদিও তিনি অপাত্রের বয়সে পরিণত হ'ন নাই—তবু ত
গিন্নী একেবারে ধিন্নি হইলেন।

অমৃতবাবুর ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে—তিনি
রক্ষিণীর Post (পোষ্ট) অধিকার করিলেন।

(B)

রাত্রিতে প্রমিলা আসিয়া হাসিতে হাসিতে প্রকৃতিবাবুর
একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন—"ওগো ঘুমুলে না কি?"

প্রকৃতিপ্রকাশ প্রথরা পত্নীর নিকট হইতে পরিত্রাণ লা
বাসনায় নিদ্রার ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়াছিলেন।
কাতুকুতু দিতেই তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে উ
দেখিয়াই প্রমীলা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত মুখটি তে
হাঁড়ী করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার সঙ্গে সব তাতে মস্করা

"আহা-হা! তাই কি পারি? হাজার হোক্ তুমি অ
তৃতীয় পক্ষ!"

"ওই-ত কথা নেই বার্ত্তা নেই কেবল আমাকে খোঁটা। কেন
মি তোমার কি করেছি—আমি কি তোমার পাকাধানে মই
য়েছি—যে তুমি যা' নয় তাই বল্‌বে।"

সঙ্গে সঙ্গে বসন-অঞ্চল চঞ্চল-নয়নে সংযুক্ত হইল। প্রকৃতি-
কাশ বাবু ত অস্থির! তিনি বাংলার বাবু; আর টাল সামলা-
বন কি করিয়া? কাজেই গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বুকের ব্যথা
ী করিয়া জানাইয়াই যেন কহিলেন—"এই সেরেছে! আবার
দতে সুরু কর্‌লে। Beg your pardon sir (বেগ ইওর
র্ডন্ সার) এবারের মত ক্ষমা কর্‌তে হবে। আমার চাকরীটে
কবারে নীরস—তাই তোমার এ সরস অভিনয়ে মোটেই
ম যোগ দিতে পারি নে।"

এই রকম করিতে করিতে সে রজনীর ঘটনা আরব্য রজনীর
র মত অনেক দূর পৌছিয়াছিল। তাহার পর কেমন
য়া যে ঘটনার মিল হইল—সে কথা লেখক বলিতে পারেন
—ভগবান্ কুসুমায়ুধ বলিলে বলিতে পারেন।

তবে এইটুকু জানি—সেই রাত্রিতে প্রকৃতিপ্রকাশ স্বীকার
য়াছিলেন—তিনি মাহিয়ানা পাইলে এ মাসে প্রমীলার ভ্রাতা
াতের জন্য চশমা কিনিয়া দিবেন। আহা বেচারা দেখিতে
না!

(C)

চশমা চোখে দিয়া বিজয়ের আনন্দে প্রভাত তাহার বন্ধু
থের বাড়ী যাইয়া হাজির হইল। কিছুদিন মাত্র হইল—এখনও

]

Tight Binding

বোধ হয় একমাস উত্তীর্ণ হয় নাই—প্রমথ যেদিন প্রথম Short sight (সার্ট সাইট্) বলিয়া চশমা লয়—সেই দিন দুই বন্ধুর তর্কের ভিতরে প্রমথ বলিয়াছিল—

"তুই কখনও চশমা নিতে পার্‌বি নে। তোর ও গোঁয়ার গোবিন্দ পুলিশ ভগ্নীপোত নেহাৎ বদরসিক, চশমার রস বুঝবে কি।"

"যদি আমি চশমা নিতে পারি"—প্রভাত কহিল।

"না, তুই কক্ষনো পার্‌বি নে"—এই রকমে তর্কটি আবার বাজীতে পরিণত হয়—প্রভাত যদি চশমা লইতে পারে—তাহা হইলে প্রমথ তাহার বউএর সঙ্গে প্রভাতের আলাপ করিয়া দিবে। আর প্রভাত? তাহার ত' বিবাহ হয় নাই। সে কি করিবে? প্রমথ বলিল—"আচ্ছা, তোর বিয়ে হ'লে বউএর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিস্। এই তোর প্রতিজ্ঞা থাক।"

প্রভাত স্বীকার করিল—"আচ্ছা, বেশ?"

প্রমথ ভাবিয়াছিল—তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। তাহার পর আজ চশমা পাইয়াই প্রভাত ছুটিয়া আসিল। প্রমথ তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। তাহার পড়িবার ঘরে তাহার ত্রয়োদশী কিশোরী ভগিনী প্রফুল্ল বসিয়া বহিগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। প্রভাত কিন্তু চশমা চোখে দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল না; সব ঘোলা ঘোলা ঠেকিতেছিল। তাহার উপর প্রমথ 'নিরুপমা' তৈল মাখিত,—প্রফুল্লের মাথায়ও সেই বঙ্গ-বিখ্যাত তৈলের মিষ্ট গন্ধ বিদ্যমান ছিল। কাজেই সে প্রফুল্লকে প্রমথ মনে করিয়া

তাহার চোক দুইটী চাপিয়া ধরিল। প্রফুল্লও অবাক্ হইয়া গেল। তবুও সে সাহসে ভর করিয়া বলিয়া উঠিল—"বৌদি!" এবং হাত দুইটী দিয়া যখন চোখের হাত খুলিতে গেল—তখন তাহার হাতের বালা প্রভাতের হাতে ঠেকিতেই প্রভাত চমকাইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছাড়িয়া দিল। প্রফুল্লও চাহিয়া দেখিল—তাহার চোখ প্রভাতবাবু ধরিয়াছেন। সে ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়াও অস্বাভাবিক লাল হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

যদিও প্রফুল্লের লজ্জার রক্তিম আভাটা প্রভাতের খুবই ভাল লাগিয়াছিল—তথাপি এই ঘটনায় নিজের বিমূঢ়তায় সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। প্রমথের নিকট আর তাহার জয়ের নিবেদন করা হইল না। সে তথা হইতে পলাইয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(D)

পাঁচ ছয় দিবস প্রভাত আর প্রমথদের বাড়ীতে যাইতে পারে নাই। তাহার ভয়ঙ্কর লজ্জা করিতেছিল। এতদিন বন্ধুদের বাড়ীর সকলে ঘটনাটী শুনিয়া তাহাকে কি মনে করিতেছেন। এই কথা যতই তাহার মনে হইতেছে—ততই সে আপন মনে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতেছে। কাজেই সে এ কয় দিবস প্রমথের সঙ্গে দেখাটাকে কলে কৌশলে এড়াইয়া চলিতেছে।

সে দিন কলেজে Proxyর (প্রক্সির) ব্যবস্থা করিয়া প্রভাত

যখন নামিতেছিল—সেই সময় প্রমথও উপরে উঠিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়াই চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"প্রভাত যে, আমি ভেবেছিলাম—তুই বুঝি দেশে গিয়েছিস্। বলি ডুমুরের ফুল হলি যে?"

প্রভাত "কাজের ভিড়" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া কোনও রকমে পলাইয়া আপনাকে বাঁচাইল। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে—সে প্রমথকে কথা দিতে বাধ্য হইয়াছিল—যে, সে নিশ্চয় বৈকালে প্রমথদের বাড়ী যাইবে।

(E)

যখন তখন প্রমথ বলিত—'প্রভাতের কি হ'ল?—সে আর আসে না কেন?' সেই সময় এক দিবস প্রফুল্ল তাহার বউদিকে বলিল--

"তিনি আর আসবেন কি? এই রকম কাণ্ড করে তিনি গিয়েছেন।"

তাহার বউদি সকল শুনিয়া—'হো-হো' করিয়া হাসিয়া কত ঠাট্টা করিলেন এবং বলিলেন—"তোমার দাদারও ওই দশা! তবে তিনি একটু বেশী চালাক। তাই কোনও রকমে চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মানটা বজায় রেখেছেন।"

যথাসময়ে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ঘটনাটী প্রমথের কাণে উঠিল। এটুকু পর্য্যন্তও বাদ থাকিল না যে, প্রফুল্ল নামটী পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। আগা-গোড়া ঘটনাটী "তিনি, তিনি" করিয়া সারিয়াছে।

সে দিন প্রভাত যখন আসিল—প্রমথ সটান স্বাগত-সম্ভাষণ আদি কিছুই না করিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে উল্লুক, সেদিন কি করে গিয়েছিলি?"

প্রভাত লজ্জায় ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না। তাহার মন তখন বলিতেছিল—'ভগবতি! বসুন্ধরে! দেহি মে বিবরং।'

প্রমথ কহিল—"স্থাথ্, তোকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রায়শ্চিত্ত দাদা?"

"ওরে বদমাইস্—!! এর মধ্যে এতদূর উঠেছিস্। অথবা "গন্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্বোঽথ" বলিয়াই প্রমথ থামিয়া গেল।

প্রভাত তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি প্রমথ, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর। আমি চশমা ছেড়ে দেব।"

"আরে, আমরাও ত' চশমা পরে থাকি। একটা ব্যুৎপত্তি করে নিতে ত' হ'য়।"

লজ্জায় তখন প্রভাত মুখ নীচু করিয়াছিল—নতুবা সে দেখিতে পাইত—প্রমথ তাহার চশমার ফাঁক দিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেছে।

"যাক্; এক কাজ কর—প্রফুল্লকে তুই নে।"

প্রভাতের চোখ দিয়া যেন একটা গরম নিঃশ্বাসের ঝলক বহিয়া গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল—"এত' প্রায়শ্চিত্ত নয়; এযে বর হ'ল দাদা!"

(F).

মেয়েও মন্দ নয়; পাত্রও সুপাত্র। সুতরাং উভয় পক্ষের কর্ত্তারা কোনও আপত্তি করিলেন না।

বাসরে চশমা লইয়া বেশ একটু ঠাট্টা চলিল। বউদি হাসিয়া কহিলেন—"ওগো ঠুসিঢাকা জন্তু, আর কখনো যেন গন্ধের মোহে অন্ধ হয়ো না।"

প্রভাত অনুভবে বুঝিল—সেই নিরুপমার দিব্য গন্ধে আজও তাহার বাসর ভরপুর। সে মনে মনে কহিল—"হে নিরুপমা, তোমার গন্ধের সত্যই উপমা নাই—তোমারি মিষ্ট গন্ধের প্রসাদে আজ আরও মিষ্ট জিনিষটী পাইলাম। তোমার জয় হউক।"

সেই সময় চশমা মুছিবার ছলে—প্রমথকে চশমা খুলিতে দেখিয়া বাসর-সঙ্গিনীরা একটুকু বিলাতি কেতায় হাস্যরসের উপভোগ করিয়া লইলেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু দিন পরে দেখা গেল—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 3rd year (থার্ড ইয়ার) মহাশয়ের যে চোখ অযথা চশমায় আবৃত ছিল—Graduate (গ্রাজুয়েট্) শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সেই চোখ হঠাৎ অভূতপূর্ব্ব উপায়ে চশমা-মেঘ হইতে খালাস লাভ করিল।

দুষ্ট লোকেরা বলিয়া থাকে—ইহার মূলে নাকি—প্রফুল্লের হস্তরেখা আছে। সে নাকি বলিয়াছিল—"নাও, এখন এটাকে ছাড়ো। নইলে আবার কবে কোন্ ফ্যাসাদে পড়্বে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ,
মহেশপুর পোঃ;
(যশোহর)

———

তৃতীয় পুরস্কার (গ)—১৫৲ টাকা।

প্রতিঘাত।

——:০:——

(১)

স্মিত-মুখী সুধা ক্ষিতীশের পড়িবার ঘরে আসিয়া ডাকিল—"ঠাকুর-পো!" ঠাকুর-পো তখন একরাশি বই চারিদিকে ছড়াইয়া, একখানা খুলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সুধার সশব্দ আগমনে চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। চক্ষু তুলিয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখ দেখিয়া বলিল—"কিছু দরকার আছে বুঝি?"

সুধা হাসিয়া বলিল—"দরকার না থাক্‌লে কি আর তোমার এমন গাঢ় অধ্যয়নে এসে বাধা দিই।" ক্ষিতীশ মাথা নাড়িয়া সাড়ম্বরে বলিল—"তবে এখন তোমার আর্জ্জি পেশ করতে পার।" সতীশ তাহার খাতা চুরি করিয়া কিরূপ জব্দ করিয়াছিল, তাহা সালঙ্কারে জানাইয়া উপসংহারে সুধা বলিল—"ওঁকে জব্দ কর্‌বার একটা মতলব বার কর।"

"আচ্ছা দাঁড়াও ভাবা যাক।"

সামনের বই খানা ঠেলিয়া ক্ষিতীশ মহা চিন্তান্বিত ভাবে মতলব

খুঁজিতে মস্তিষ্কের অনন্তভাণ্ডার তোলপাড় করিতে লাগিল। সুধা তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। "হাসি নয়, একটা উপায় ঠিক হয়ে গেছে।" টেবিলের উপর কুনুয়ের ভর দিয়া সামনে হেলিয়া সুধা বলিল—"কি হলো?" "দাদার নামে এক-খানা চিঠি লেখা যাক।" সুধা সাগ্রহে বলিল—"কি চিঠি বল তো?" "এই নানা রকম ভয়—" বাধা দিয়া তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুধা বলিল—"উঁহুঁ, বরং লেখা যাক, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তোমায় না দেখ্‌লে আমার অন্তরে দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে, তুমি আফিসে যাও আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু নিষ্ঠুর তুমি—ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি সেদিন বল্‌ছিলে পাশের বাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের মেয়ে ছেলে নেই, তা' সেই ঠিকানাই দেওয়া যাক, এখনো আলাপ হয়নি, কিছুই ধরতে পারবে না।" ক্ষিতীশ মহা উৎসাহে বলিল—"হুঁ, হুঁ, ঠিক, ঠিক, তাই লেখা যাক।"

একটা মজার আভাস পাইয়া দুইজনে পরম আগ্রহে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল।

ক্ষিতীশ অতি পরিশ্রমে চিঠিখানা আগা-গোড়া কাঁচা অক্ষরে লিখিয়া দিল। তাহার কি গভীর ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! কি মধুর প্রণয় নিবেদিত হইল! সমস্তই অতি বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইল। পত্র রচনা করিয়া দিল সুধা, ক্ষিতীশের বিবাহ হয় নাই, সে বেচারা ও সকলের কোন আস্বাদই জানে না। তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা আফিসের ঠিকানায় ডাকে পাঠাইয়া দুইজনে নিশ্চিন্ত হইল। ক্ষিতীশ মৃদু হাসিয়া বলিল—"বৌদি, দাদাকে

পরীক্ষা করছ না কি?" সুধাও কৌতুক হাস্যে বলিল—"দেখাই যাক না, লোকটা কেমন।"

(২)

পরদিন সন্ধ্যা বেলা সতীশ ঘরে ফিরিলে সুধা তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিতে গেল। তাহার চোখে মুখে যেন কৌতূহল ফুটিয়া উঠিতেছিল। যত্নে আত্মসংবরণ করিয়া সে ল্যাম্প্‌টা টেবিলের উপর রাখিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল সতীশ একখানা আরাম কুর্সিতে আড় হইয়া পড়িয়াছে। সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অমন করে শুলে যে, অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

সতীশ একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"না!" উৎকণ্ঠিতের ভাণ করিয়া সুধা বলিল—"তোমায় বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে!"

সে কথার জবাব না দিয়া কাপড় ছাড়িয়া সতীশ অন্যমনা হইয়া বাহির হইয়া গেল। সুধা হাসিতে হাসিতে সদয় ভাবে বলিল—"আহা বেচারা কি ভাবছে কে জানে!" রাত্রেও সে সতীশের কাছে কোন কথা পাইল না। পাছে ধরা পড়িয়া যায় সেই ভয়ে নিজেও অতি সতর্ক হইয়া রহিল। কিন্তু স্বামী তো তাহার কাছে কোনও কথা গোপন করেন না, আজ একথাটা বলিলেন না দেখিয়া তাহার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল চিঠি খানা লইয়া সতীশ তাহার কাছে পড়িয়া একটা

হাসাহাসি করিবে, হয়তো তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সামান্য দুই একটা কথার পর "বড় ঘুম লাগছে" বলিয়া সতীশ ফিরিয়া শুইল। খানিকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিয়া সুধার দুই চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একটা মৃদু শব্দে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, সতীশ অতি সন্তর্পণে খাট হইতে নামিতেছে। ব্যাপার কিছু না বুঝিতে পারিয়া সে নিদ্রিতের মত চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। সতীশ উঠিয়া ধীরে ধীরে আলো জ্বালিল। তারপর কোটের পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে লাগিল। মাথা তুলিয়া দেখিয়া সুধা এইবার সমস্ত বুঝিল; স্বামী যে রহস্য ভেদের চেষ্টা করিতেছেন। সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

খানিক পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সতীশ খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। পাশেই সেই কল্পিতা নায়িকার বাড়ী খানি অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডায় টবের গাছগুলিতে ফুল ফুটিয়া তাদের স্নিগ্ধ সৌরভ টুকু মৃদু বাতাসে নানা দিকে ভাসাইয়া দিতেছিল।

বিভ্রান্তচিত্তে আলো নিভাইয়া সতীশ শুইয়া পড়িল। ঘুমাইবার পূর্ব্বে পত্নীর অধরে নিয়মিত চুম্বনটি বসাইতে তাহার ভুল হইয়া গেল।

সুধা স্বামীর নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

(৩)

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সুধা যখন তাহাদের উত্তর দিকের জানালাটা খুলিয়া বাহিরে চাহিল, তখন সেই বাড়ী থানার ছাদের দিকে চাহিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। একটি অতি সুন্দরী কিশোরী ছাদের আলিসায় একখানা ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল। সদ্য:স্নাতা রূপসীর রাশি রাশ কালো চুলের মধ্যে ঢল্-ঢলে সিক্ত মুখখানি যেন শিশির-ধৌত পদ্মের মত ফুটিয়া আছে। তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটিও কৌতুকভরে সুধার দিকে চাহিল। সতীশ উঠিয়া বসিয়াছিল, সে সুধার রকম দেখিয়া বলিল—"কি দেখ্‌ছ বলতো?" আত্ম-বিস্মৃত ভাবে সে বলিয়া ফেলিল—"কি সুন্দর মেয়েটি!"

"কই কই!" সতীশ আগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুধা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানিয়া বিদ্রূপ-ভরে বলিল—"দেখ্‌বে নাকি?" বেচারা থতমত খাইয়া গেল।

মনের মধ্যে অনেক খানি আগুনের হল্‌কা বহিয়া সুধা দ্রুত-পদে ক্ষিতীশের ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"কি অনর্থ বাধালে বল তো ঠাকুর-পো!" অনর্থটা যদিও দুই জনেই বাধাইয়াছে তথাপি এ স্থলে ক্ষিতীশের ঘাড়ে সমস্ত দোষটা চাপাইতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না।

ক্ষিতীশ অবাক্ হইয়া বলিল—"কি হলো গো?"

"তুমি যে বলেছিলে পাশের বাড়ীতে ওদের মেয়েরা নেই, আমি তো দেখ্‌লুম রয়েছে।" ক্ষিতীশ তাচ্ছল্যভরে বলিল—"সে হয়তো দুই একটা বুড়ী-ফুড়ী আছে।"

সুধার হাসি আসিল, বুড়ী-ফুড়ী যেন স্ত্রীলোকের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়! সে বলিল—"না, না, আমি দেখ্‌লুম একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে আছে।"

ক্ষিতীশ সেই রূপেই বলিল—"ও এক-আধটা ছোট-খাট মেয়ে থাক্‌তে পারে।"

অসহিষ্ণু ভাবে সুধা বলিয়া উঠিল—"ছোট কেন, আমারই মতন একজন আছে।"

তবুও ক্ষিতীশের কোনো রকম আগ্রহ দেখা গেল না—নেহাৎ শুষ্ক ভাবে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন শুনেছি ওদের মেয়ে ছেলে কেউ নেই এখানে।"

মনের ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে সুধা বলিল—"সব ভাল না জেনে আমাদের এমন লেখাটা অন্যায় হয়েছে, উনি মেয়েটিকে দেখ্‌তে পেলে কি ভাব্‌বেন বল তো?"

এইবার একটু বিচলিত হইয়া ক্ষিতীশ বলিল—"তুমি সব দাদাকে খুলে বলে দাও বৌদি।"

"হুঁ তাই বলি।" সুধা ফিরিল। অকস্মাৎ ক্ষিতীশ লাফাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"লক্ষ্মী বৌদি, দাদার কাছে যেন আমার নাম-টাম করো না, তা' হলে আমি মুখ দেখাতে

পারবো না। তোমার কথাতেই লিখে দিয়েছিলুম, দোহাই।" ইত্যাদি নানারূপ মিনতি করিয়া সে তিন সত্য করাইয়া তবে ছাড়িল; সে জানিত বৌদিদির কাছে এই তিন সত্যের মার নাই।

(৪)

ঘরের কাছে আসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া সুধা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। দেখিল, দরজার দিকে পিছন করিয়া সতীশ সেই জানালাটার খড়খড়ি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে। চোরের মত সে কি সন্ত্রস্ত ভাব!

স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া তাহার দেহের রক্তপ্রবাহ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সতীশ ধীরে ধীরে খড়খড়ি নামাইয়া সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, কি প্রগাঢ় মনোযোগ। পশ্চাতে পত্নী যে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পড়িতে পড়িতে সহসা পরম অনুরাগে সেখানাকে চুম্বন করিল। চিঠিখানা যদিও সুধারই প্রদত্ত, তবুও সে ইহাতে বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ না করিয়া থাকিতে পারিল না। চকিতে পিছনে চাহিয়া সতীশ বিষম চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। বিনা-কৈফিয়তেই সে নির্ব্বোধের মত বলিয়া ফেলিল—"নরেনের চিঠি ক'দিন হল পেয়েছি।" "মিথ্যাবাদী!"—রাগে সুধার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অপ্রস্তুত হইয়া হাসিবার ভাণ করিয়া সতীশ বলিল—"বুঝতে পাচ্ছ না, নরেন মজা করে এখানা এমন করেই লিখেছে।"

"ফের মিছে কথা, আমি তোমায় ঐ চিঠি লিখেছি।" অতিমাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সতীশ বলিল,—"তুমি?"

"হাঁ, আমিই তোমায় ঠাট্টা করে ওচিঠি লিখেছি।" সতীশ ঘাড় নাড়িয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। অসহ্য রাগে সুধা চীৎকার করিয়া বলিল—"পাশের বাড়ীর ঐ সুন্দরী লিখেছে মনে করে ভারি ভাল লাগ্‌ছে না?"

সতীশের মুখ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"পেছন থেকে পড়ে নিয়ে বুঝি এই অভিনয় হচ্ছে? তুমি জান আমি মিছে কথা ভালবাসি না; চিঠি যেই লিখুক তোমার মাথাব্যথার দরকার নাই।" সত্যবাদী পরমহংসের মত গম্ভীর স্বরে কথা কয়টা বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সুধা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অত্যন্ত সত্য কথাটা স্বামীকে বিশ্বাস করাইতে না পারিয়া সে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কেন এমন হইল তাহার একটা অস্পষ্ট কারণ যেন তাহার মনে ঝাপ্‌সা হইয়া বেড়াইতেছিল, সে গুছাইয়া ভাবিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া হঠাৎ সে আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। একটু আগে যে সন্দেহটা তাহার মনের মধ্যে ছায়া ফেলিতেছিল, এখন সেটা পরম সত্যরূপে দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্ষোভে, দুঃখে, বিস্ময়ে সে যেন পাষাণ হইয়া পড়িয়া রহিল।

(৫)

কতক্ষণ পরে স্কুলের বেলা হওয়ার জন্য ঠাকুরকে বিষম তাড়া

লাগাইয়া নিজের পাঠানুরাগটা দাদাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে করাইতে
ক্ষিতীশ বৌদিদির খোঁজে আসিয়া দেখিল সে দেয়ালে পিঠ রাখিয়া
বসিয়া পাগলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে। অবাক
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বৌদি?" বৌদিদির ঠোঁট
দুইখানি ঈষৎ স্পন্দিত হইল মাত্র, কোন স্বর শুনা গেল না। ক্ষিতীশ
বসিয়া পড়িয়া ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা বুঝি সেই জন্য বড়
বকেছে?"

এবার মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল—"না, বড় মাথা ধরেছে।" ইহারি
মধ্যে কি প্রকারে এত মাথা ধরিয়া গেল যে বৌদিদির মুখশ্রী একে-
বারে এমন বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিতর্ক
মনে না আনিয়া ক্ষিতীশ তাহার হাত ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া
মাথায় বাতাস দিতে দিতে বলিল—"একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর
দেখি, তা'হলে সেরে যাবে।" এবং খানিক পরে রান্নাঘরে গিয়া
ঠাকুরকে জানাইয়া আসিল যে এখন তাহার ভাত বাড়িবার
প্রয়োজন নাই, বৌদিদির অসুখ করিয়াছে, সে আজ স্কুলে যাইবে
না।" অবশ্য একথাটা বলিবার সময় সতীশ যাহাতে শুনিতে না
পায় তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

বিছানায় পড়িয়া সুধা নানারকম এলোমেলো চিন্তার স্রোতে
ভাসিয়া পড়িল। হায়রে, কেন মরিতে সে ঐ অলক্ষণে চিঠিখানা
লিখিয়াছিল, যদিও লিখিয়াছিল তো আগে কেন পাশের বাড়ীতে
ভাল করিয়া খোঁজ লয় নাই। আর ঐ মেয়েটাই বা কেন এত
দেশ থাকিতে এখানে মরিতে আসিল। সে নিশ্চয়ই কয়েকবার

স্বামীর চোখে পড়িয়াছে, নহিলে একখানা চিঠিতে কি অতটা
বাড়াবাড়ি হয়। মেয়েটা যদি মানুষ না হইয়া অন্য কোন প্রাণী
হইত, তাহা হইলে এতক্ষণ দয়া করিয়া সুধা তাহার ভবযন্ত্রণার
অবসান করিয়া দিত। ক্রমে সেই ঘরেই কাপড় ছাড়িয়া সতীশ
আফিসে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত সুধাকে
বিছানায় দেখিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। স্বামীর
এই নির্ম্মম ব্যবহারে অভিমানে তাহার বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।
একি কাণ্ড! একদিনেই কি সে স্বামীর হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত
হইয়া পড়িল! এমন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, প্রেমময় স্বামী তাহার,
কি কুহকে, কে এমন রাক্ষসে পরিণত করিয়া দিল! আকুল
মর্ম্ম-বেদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

(৬)

বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া সতীশ তখনও পত্নীকে বিছানায়
দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সুধা চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল, পদশব্দে
একবার চোখ চাহিয়াই আবার মুদ্রিত করিল। জ্বরে তাহার
গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। উত্তপ্ত ললাট খানি
বেরিয়া বন্ধনমুক্ত কয়েক গাছা রুক্ষ চুল পাখার বাতাসে উড়িয়া
উড়িয়া চোখের উপর পড়িতেছে, সুকৃষ্ণ দীর্ঘ বেণীটি বালিশের
আরেক প্রান্তে গিয়া লুটাইতেছে, ঠোঁট দুখানি থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপিয়া উঠিয়া বহুক্ষণ পূর্ব্বের রোদনের আভাস জানাইতেছে।
মুদিত চক্ষুর পাশে অস্পষ্ট শুষ্ক অশ্রুচিহ্ন আর কারো চোখে না
পড়িলেও সতীশের দৃষ্টিতে এড়াইল না। ক্ষিতীশ বিষণ্ণমুখে শিয়রে

বসিয়া পাখা করিতেছিল, সতীশকে দেখিয়া ভরসা পাইয়া বলিয়া উঠিল—"দাদা, বৌদির জ্বর হয়েছে।" ব্যথিত সতীশ তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া থার্ম্মোমিটার লইয়া বসিল। স্বামীর পানে সঙ্কুচিতা সুধা চাহিয়া দেখিল। অপবিত্র জীব! হইলই বা স্বামী। সে ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল—"কিছু হয়নি আমার, তোমায় দেখতে হবে না।" তাহার কথার ঝাঁকে সতীশ প্রমাদ গণিল। ক্ষিতীশ এতক্ষণ পরে ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পলায়ন দেখিয়া সতীশ মৃদু হাসিয়া স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হল কি?" কথাটা যেন সুধার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরাইয়া দিল। এখন তাহার মনে দুঃখ অভিমানের কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া ক্রোধে, উত্তেজনায় অন্তর্দ্দাহ আরম্ভ হইয়াছে, তাই আর কান্না আসিল না, সে তৎক্ষণাৎ পাপিষ্ঠের মুখ দেখিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সতীশ একটু হাসিয়া বলিল—"তা, না হয় নাই কথা কইলে কিন্তু তোমার জন্য যে দু'শিশি নিরুপমা এনেছি, রেখে দাও।" নিরুপমার প্রতি স্ত্রীকে অত্যন্ত অনুরক্ত জানিত বলিয়া সতীশ একটু খোঁচা দিয়া কথাটা বলিল। মুখ ফিরাইয়া সুধা সরোষে বলিল,—"আমার চাই না, দাওগে ঐ ওদের বাড়ীর ছুঁড়ীটিকে।" "চাই না? বটে এমনই অকৃতজ্ঞ! তবে দাও তোমার ঐ লম্বা বিনুনিটি, কেটে নিরুপমার অফিসে ফেরৎ দি, ধরতে গেলে ওটাতো—" বলিতে বলিতে সে সুধার নিরুপমা-সুরভিত চিকণ দীর্ঘ বেণীটিতে একটা বিষম টান দিল। অধীর হইয়া সুধা ফিরিয়া বলিল—"তুমি সবদিক্

থেকে কেন এত জ্বালাতন কর্‌ছ বলতো?" "আজ এত রাগ কর্‌ছ কেন?" সে তীব্রস্বরে বলিল—"রাগের কারণ কিছুই ঘটেনি নাকি?" সতীশ মূঢ়ের মত চাহিয়া বলিল—"ঘটেছে নাকি? কি করে ঘট্‌ল বলতো?" ক্রোধে গুম্‌রাইতে গুম্‌রাইতে সুধা বলিল—"ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, ল—" বাধা দিয়া সতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুধা তখন উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, মুখখানা সিন্দূরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া হাসি থামাইয়া সতীশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ব্যস্ত হইয়া মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া সুধা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ধীরে ধীরে দুই এক ফোঁটা অশ্রু নেত্রপল্লব সিক্ত করিতে লাগিল। বেদনা পাইয়া সতীশ তাহার চক্ষু মুছাইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"শান্ত হও, ছি! একটা তামাসা বুঝতে পার না!" সুধা চমকিত হইয়া বলিল—"কি তামাসা?" "এই যে সব তোমায় দেখিয়ে পাগলামি করেছি।"

সুধা সবিস্ময়ে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"সব মিথ্যে নাকি? "সব মিথ্যে, সব মিথ্যে সুধা, শুধু তোমার দুষ্টুমির একটু প্রতিফল দেব বলে অমন ভাণ করেছি।" "সেই চিঠির পড়ার ব্যাপার, খড়খড়ি দিয়ে উঁকি দেওয়া, ও সব কি মিথ্যে হতে পারে?" সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি সব দেখতে পাচ্ছ, জানতে পাচ্ছ বলেই তো ঐ মজা করেছিলুম, তোমার মুখে চিঠিখানা তোমার শুনেও অগ্রাহ্য করেছিলুম, এখন দেখছি তা'তে ফলও বেশ ফলেছিল, এমন তুমি অ্যাঁ!" খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া সুধা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু

পাশের বাড়ীর সেই—" বাধা দিয়া সতীশ বলিল—"ব্যথা যে কোন্ খানে তা' আমি অনেকক্ষণই বুঝেছি। ভয় নাই, তোমার জিনিষ কখনো তোমার হাতছাড়া হবে না, ওসব দুষ্টামি, আর আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসবে? কেমন?" দুঃস্বপ্নমুক্তের মত একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা তৃপ্ত স্বরে বলিল—"এত দুষ্টু তুমি উঃ!" "আর তুমি মহাশয়া খুব সদাশয়া, কি বল? যা' হোক চিঠিখানা বানিয়ে ছিলে বটে!" "কি করে বুঝলে ও চিঠি আমারই দেওয়া?" "কি করে বুঝলুম? সন্দেহ আগেই হয়েছিল, তারপর একটা অব্যর্থ প্রমাণ পেয়েছি দেখ্‌বে?" সতীশ পাশের ঘরে গিয়া ক্ষিতীশের টেবিল্ হইতে ব্লটিং প্যাড্ খানা আনিয়া দেয়ালের আয়নায় ছায়া ফেলিয়া বলিল—"এই দেখ প্রমাণ।" দুই একটা কথা বাদে সমস্ত চিঠিখানাই পরিষ্কার করিয়া সে আবার পড়িয়া ফেলিল। সমস্ত বুঝিয়া সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল—"উঃ কি গোয়েন্দা তুমি! এবার আর কখনো সাদা ব্লটিঙে চিঠি ছাপ্‌ব না, ঐ বিশ্বাসঘাতক প্যাড্ খানাই তা'হলে ধরিয়ে দিয়েছে।" সতীশ কাছে আসিয়া তাহার দুশ্চিন্তামুক্ত তপ্ত ললাটে একান্ত স্নেহের সহিত ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া বলিল—"নিশ্চয়!"

শ্রীপ্রতিভা দেবী
কলিকাতা।

———

চতুর্থ পুরস্কার (ক)—৫৲

হারিয়ে বিষাদ।

—০:*:০—

(১)

জানালার ধারে বসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া সতীশ গায়িতেছিল—

ওই নদীর ওই ঘাটেতে
এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসীটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।

শিশির আসিয়া বলিল, "ওহে, শুন্‌চ, আর-গান-টান গাওয়া হবে না।"

সতীশ সে কথা কাণে না তুলিয়া গাহিয়া চলিল—

সোহাগে জল উথলে উঠি,
পড়্‌ত তাহার বক্ষে লুটি,
পথে দেখে আমায় প্রিয়া
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।

শিশির ভাবিল, সতীশ শুনিতে পায় নাই। উচ্চকণ্ঠে বলিল—"আজ থেকে গান-বাজনা বন্ধ করতে হবে।"

সতীশ গান থামাইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—"কেন?"

"পাশের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক এসেচেন।"

"বেশ!"

"তাঁর সঙ্গে একটা ষোড়শী যুবতী আছেন!"

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"মাইরি? একেবারে সুইট্ সিক্সটীন্ (Sweet sixteen)!"

"এযে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! আগে শোনই ছাই!"

"হ্যাঁ, বল। তারপর?"

"ভদ্র লোকটী আজ সকালে আমায় ডেকে স্পষ্ট বল্লেন, অন্ততঃ তিনি যদ্দিন আছেন, গান-বাজনা বন্ধ করতে হবে।"

"তুমি তার কি জবাব দিলে?"

"আমি ঘাড়টী নেড়ে গুড্ বয়ের মত বল্লুম, 'যে আজ্ঞে'।"

সতীশ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "না! তুমি নেহাৎ ভীতু, বেশ দু'চারটে কড়া বোল্‌চাল্ দিতে পারলে না?"

"হাজার হোক্, ভদ্দরলোক, সাম্‌নাসাম্‌নি বলাটা—"

সতীশ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"কোথাকার কে ভদ্দরলোক, তাঁর আবার কথা শুনে চল্‌তে হবে, তাহলেই ত গেছি!"

সঙ্গীত-চর্চ্চা ছিল সতীশের সব কাজের চাইতে বড়। রুষ্ট-মুখে হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সতীশ গলা খাঁখারি দিয়া আরম্ভ করিয়া দিল,—

"আমায় গাহিতে ক'রনা মানা।"

শিশির একটু মুচ্‌কি হাসিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিয়া পড়িল। পরেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সতীশের তখনও রাগ পড়ে নাই, গান বন্ধ করিয়া বলিল,—"শুনেচ পরেশ, ব্যাপার-খানা?"

পরেশ হুজুক পাইলেই বাঁচে! জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হ'য়েচে?"

"আজ থেকে যে গান-বাজনা বন্ধ করতে হবে।"

উৎকণ্ঠায় পরেশের পেট ফুলিতেছিল। বলিল, "গান বন্ধ করতে হবে কেন?"

সতীশ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল,—"কেন'র উত্তর ঐ পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটী দেবেন।"

ঘ্রাণের দ্বারা পরেশের অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে। এখন কথাটা না পারে গিলিতে, না পারে উগ্‌রাইতে।

ক্রুদ্ধ সতীশ ত' কথাটা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিল না।

পরেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শিশির কথাটা বুঝাইয়া দিল, "ঐ যে হে স্থূলোদর ভদ্রলোকটি, পরশুদিন এলাহাবাদ থেকে এসেছেন, তিনিই গান গাইতে মানা করেচেন। তাঁর সঙ্গে একটি যুবতী আছেন কি না—"

"ওহো, বুঝেচি, বুঝেচি—আর বলতে হবে না। এখন তাঁর ভয় হচ্চে, পাছে গান শুনে যুবতীটির লভ্‌সিক্‌নেস্ (Love sickness) হয়, এই ত!"

দেখিতে দেখিতে রমেশ, সুরেশ, প্রকাশ, সুধীর, অতুল,

কালী, ফণী ইত্যাদি সমবেত হইল এবং সকলে একে একে আজিকার এই দারুণ দুঃসংবাদ অবগত হইল। ফণী মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল, "হুঃ! আমরা ওর পেয়েরের পেয়াদা কি না যে যা' বলেন, তাই শুনতে হবে। ওহে সুরেশ, একখানা গাওনা ভাই।"

সুরেশের সাহসটা কিছু কম। গান গাহিলে পাছে কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অতুল মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ভয় কি, গাওনা। আমি বল্‌চি, কিছু ভয় নেই। আমার খুড়শ্বশুর ক্যাল্‌ক্যাটা পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর। বুড়ো কি করতে পারে, দেখা যাবে?"

সুরেশ হারমোনিয়মের চাবি টিপিল। প্রকাশের অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে। প্রকাশ বলিল,—"সেই গানটা সুরেশ!"

সুরেশ হারমোনিয়মের চাবিগুলির উপর অঙ্গুলি চালনা করিয়া বলিল,—"কোন্‌টা?"

"সেই যে সে দিন গাইছিলে,—জনম অবধি হাম—"

সুরেশ গাহিতে লাগিল—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।

'গায়ক' বলিয়া সতীর্থ মহলে সুরেশের একটা খ্যাতি ছিল। অল্পক্ষণে গান ভরপুর জমিয়া উঠিল। কালী সেল্‌ফ্‌ হইতে এক খানা মোটা বই টানিয়া লইয়া ঘাড় দুলাইয়া তাহার উপর চাঁটি দিতে লাগিল। সুধীর নাকি দেশে এমেচার পার্টিতে একবার 'আবদালা'র পার্ট করিয়াছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া

মুখ চোখের ভঙ্গী করিয়া তালে তালে নাচিতে সুরু করিয়া দিল।

ঘর গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের সাম্‌নের বারান্দায় চটি জুতার চট্‌পট্‌ শব্দ হইল। সুরেশের মুখখানা ভয়ে শুকাইয়া গেল। গান থামাইয়া বলিল,—

"কে হে ওখানে?"

সুধীর নাচিতে নাচিতে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "কে আবার, তোমার বিরহ-কাতরা প্রেয়সীর সূক্ষ্ম দেহ। এমন প্রেমগদগদ গান শুনে তিনি কি আর স্থির থাকতে পেরেচেন।"

প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "গাওনা, দেরী করচ কেন? এখনি ঠাকুর খেতে ডাক্‌তে——"

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সহসা দরজার সম্মুখে সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্ত্তে একটী স্থূল দেহের আবির্ভাব হইল। সকলে চকিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল।

স্থূলদেহের অধিকারী ভদ্রলোকটী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দেখুন মশাইরা, এ রকম অত্যাচার কর্‌লে আরত টেঁকা যায় না।"

সতীশ অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল, "অত্যাচার! কিসের অত্যাচার মশাই?"

"ভদ্রলোকের বাড়ীর পাশে দিন রাত গান তামাসা, মেয়ে-ছেলেরা রয়েচেন—" ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সতীশ কৃত্রিম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সে কি

মশাই? লোকে পয়সা খরচ করে থিয়েটারে গান শুনতে যাচ্ছে, আর যদি ঘরে বসে দিব্যি আরামে এমন সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ করা যায়, সেটা কি নেহাৎ মন্দ?"

ভদ্র লোকটি সতীশের কথার কোন উত্তর না দিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার কপাল দিয়া স্বেদ নির্গত হইতেছিল, তরমুজের মত উদরটী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সতীশ ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "রামচরণ, কর্ত্তাকে এক গেলাস সরবত দিয়ে যাও তো।"

কর্ত্তা সতীশের মুখের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্ শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সতীশের কাণে আসিয়া পৌঁছিল,—"এটা মেস নয়, মেষের আড্ডা।"

সুরেশ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "তাইত এ রকমটা হবে জান্‌লে কে আর গান গাইত!"

কালীর গায়ে বিলক্ষণ জোর ছিল। পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া সে বলিল, "মাইরি বল্‌চি সতীশ, ব্যাপারটা যদি আর একটু গড়াত, এই এক ঘুঁসীতে বুড়োর ভুঁড়ীর দফারফা করে ছাড়তুম।"

দুষ্টামিতে সতীশ খুব পাকা। গুরু মহাশয়ের টিকির উচ্ছেদ সাধন করা, রায়েদের বাগানে রাত দুপুরে আম চুরি করা ইত্যাদি এড্‌ভেঞ্চার্ ছেলেবেলায় সে অনেক করিয়াছে। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ ভাই, বুড়োকে জব্দ করতে হবে। থাম্‌কা

এসে কিনা অপমান করে গেল!" তারপর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, "আমি একটা মতলব এঁটেচি। আজ রাত্তিরে সকলে মিলে বুড়োর বাড়ী লুঠ করতে হবে—ঘটি বাটি ট্রাঙ্ক বাক্স সব কিছু। কিন্তু নিঃশব্দে, বুড়ো যেন কিছু না জানতে পারে। কেমন পারবে ত?"

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আল্‌বৎ।"

ঠাকুর আসিয়া বলিল, "ভাত বাড়া হইয়াছে। সকলে আপন আপন ঘৃতের শিশি, আচারের কৌটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

(২)

পরদিন সকালে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া সতীশের প্রকোষ্ঠে গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। সতীশ বলিল, "যাই বল, কালীর বাহাদুরী আছে। এত বড় ট্রাঙ্কটা একাই মাথায় করে নিয়ে এসেচে।"

পরেশ, সতীশের পৃষ্ঠে একটা প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়া বলিল, "বাঃ! আমার বুঝি কিছু বাহাদুরী নেই? থালা বাসনগুলো এমন ভাবে এনেচি, যে একটু টুংটাং শব্দ হয়নি।"

ফণী বলিল, "সুধীর কি পেয়েচে, শুনেচ?"

সতীশ বলিল, "না, কি পেয়েচে?"

ফণীকে বলিতে হইল না, সুধীর একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কপালে করাঘাত করিয়া আর্দ্র স্বরে বলিল, "পোড়া অদৃষ্ট! কি আর পান বল, এক জোড়া জুতো। চুরি করতে গিয়ে হাড়ির হা'ল!" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অতুল এক পাশে চুপ্‌চাপ বসিয়া ছিল। সে একটি মুখ চোরা। সতীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পেয়েচ, অতুল?"

অতুল বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। সারা ঘর চুঁড়ে হায়রাণ হ'য়ে শেষকালে টেবিলের ওপর এক শিশি তেল পাওয়া গেল। নেহাৎ শুধু হাতে ফিরব, তাই শিশিটা পকেটস্থ করলুম।"

"কি তেল হে!"

"ব্যানার্জ্জীর নিরুপমা। বেশ ভুরভুরে গন্ধ।"

তারপর সকলে যে যাহা পাইয়াছিল একে একে বিবৃত করিল। সতীশ বলিল, "এখনও শাস্তি বাকি আছে। আজ আর একটা কিছু করতে হবে।"

কালী বলিল, "আমরা এ বিষয়ে Novic (নভিস্), তুমিই না হয় একটা মতলব বাৎলে দাও।"

সতীশ কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া মতলব ভাঁজিতেছিল, শিশির হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, "ওহে, বুড়ো যে তোমাদের তাড়নায় বাড়ী ছেড়ে পলাতক!"

সতীশ আমোদ অনুভব করিয়া বলিল, "তাই নাকি?"

"আমি এই মাত্র দেখে এলুম, সদর দরজায় তালা লাগানো। এক ব্যাটা খোট্টা দরোয়ান বসে রয়েচে, জিজ্ঞাসা করে জানলুম, বুড়ো আজ সকালের ট্রেনে এলাহাবাদ ফিরে গিয়েচে।"

সতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"হা হা হা! আচ্ছা জব্দ!"

(৩)

উক্ত ঘটনার তিন দিন পরে একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া সতীশের নামে একখানা পত্র দিয়া গেল। সতীশ সম্প্রতি বাসা বদল করিয়াছিল। পত্রখানি Redirect হইয়া এখানে আসিয়াছিল। পত্র পড়িয়া সতীশ অবাক্! পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার শ্বশুর মহাশয়—এলাহাবাদ হইতে। পত্রের মর্ম্ম এই:—

সতীশের শ্বশুর এলাহাবাদে ডাক্তারী করেন, কলেরার প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাঁহার এখন আহারাদি করিবারও অবকাশ নাই, সর্ব্বদাই রোগী লইয়া ব্যস্ত। সে কারণ তিনি স্বয়ং আসিতে না পারায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদবিহারীর সহিত কন্যা মণিমালাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কথা ছিল, কলিকাতায় দুই চারিদিন থাকিয়া বিনোদ বাবু মণিকে তাহার শ্বশুর বাড়ী হুগলীতে পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ বিনোদ বাবুর—নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ বাসায় চুরি হওয়ায় তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন আগামী ৺পূজার সময় মণিমালাকে হুগলী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।

কালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আজ তোমার চা হবে না, সতীশ? সাতটা বেজে গেছে যে, চট্ করে ষ্টোভে জল চড়িয়ে দাও।" বলিয়া পরক্ষণেই সতীশের বিমর্ষ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার অসুখ করেচে নাকি? মুখখানা যে শুকিয়ে গেচে!"

সতীশ উত্তর না দিয়া তাহার সাম্‌নে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া দিল। চিঠি পড়িয়া কালী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "তাইত, কে আগে জান্‌ত, উনি হচ্চেন তোমার খুড়শ্বশুর! হ্যাঁহে, তুমি কি ওঁকে চিন্‌তে না?"

সতীশ বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "আমার বিয়ের সময় উনি আসতে পারেন নি, কাজেই আর দেখা ঘটে ওঠেনি। সরকারী কাজ করেন, ছুটি কম।"

উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। "আহা হা! বাড়ীর পাশে ছিল তা একটিবার চোখের দেখা দেখতে পেলুম না!" বলিয়া সতীশ অলস দেহখানি তাকিয়ার উপর হেলাইয়া দিল।

কালী সতীশের পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, "যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। দশটা বাজে, এখনি কলে জল চলে যাবে। স্নান করে এসে একটু সরবতের ব্যবস্থা কর, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে খন।"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।
শ্যামবাজার;
কলিকাতা।

চতুর্থ পুরস্কার (খ) ৫৲ টাকা

ভাইফোঁটা

—০:*:০—

তখন কার্ত্তিকের শেষ, বেশ একটু শীতের আমেজ দিয়াছিল। সকালবেলা লেপের মধ্যে দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছিলাম এমন, সময় ছোটবোন নিরুপমা আসিয়া বলিল 'দাদা আর গড়িয়ো না তাড়াতাড়ি উঠে কাজকর্ম্ম সেরে নাও, আজ যে ফোঁটা নিতে হবে।'

তাইত আজ যে ভাইফোঁটা। আর দেরী না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম, নিরুকে কি উপহার দিব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় চট্ করিয়া মনে পড়িল সুগন্ধি কেশতৈল 'নিরুপমা' আর নিরুপমা দেবীর 'দিদি'র কথা।

একখানি 'দিদি' ও ষ্ট্রাণ্ডরোড হইতে একশিশি নিরুপমা কিনিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখি কোটের পকেটে এক লম্বা বাজারের ফর্দ্দ, পাছে আমি রাজী না হই এই ভয়ে বোন্‌টী অজ্ঞাতে আমার পকেটে সেটীকে রাখিয়া দিয়াছে।

আবার হক সাহেবের বাজারের দিকে ছুটিতে হইল; পথে বন্ধু সুরেনের সঙ্গে দেখা; সে একা হোষ্টেলে থাকে, তাহাকে আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করিলাম।

মাছ, তরিতরকারী কিনিয়া যখন মেওয়ার ষ্টলগুলির দিকে চলিয়াছি, এমন সময় আমেদ শা আবদালীর বংশধরেরা সপ্তরথীর মত আমাকে অভিমন্যু করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা পলাণ্ডুগন্ধোদ্‌গারী চীৎকারে যখন সমস্বরে বলিতে লাগিলেন 'বাবু সাহেব, হামরা দোকানমে চলিয়ে, তাজা আথ্‌রোট, আঙ্গুর মিলেগা'। তখন মনে হইতেছিল বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ কেনা চুলোয় যাক্ গে, বাড়ী ফিরিতে পারিলে বাঁচি।

এইরূপ সম্বোধনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোন্ দিকে যাইব ঠিক করিতে পারিতেছি না, এমন সময় এককোণ হইতে বীণার মত সুকোমল স্বরে কে বলিয়া উঠিল 'ভাইসাহেব ইধার আইয়ে।' আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে গতিনির্দ্দেশ করিলাম। আশ্চর্য্য-বোধ হইতেছিল, এই নীরস, শুষ্ক, কঠোর লোকগুলির গুরুগম্ভীর চীৎকার উপেক্ষা করিয়া কে এমন মোহনস্বরে আমাকে আহ্বান করিতে পারে, কাহার এ মধুর সম্ভাষণ, যাহা আমার অন্তরে আজ চির পরিচিতের মত আসিয়া আঘাত করিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম একটী কাবুলী তরুণী। অঙ্গে তাহার কৈশোরের লাবণ্য-লালিমা উছলিয়া পড়িতেছিল। রসাল-ফলভারাবনত দ্রাক্ষালতার মত তাহার নিটোল স্বাস্থ্যভরা দেহ; কুঞ্চিত কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে আরক্ত কপোল-দেশ স্পর্শ করিয়া দুলিতেছিল। জীবনে কোন দিন এমন রূপ দেখি নাই। মাদকতার লেশবিহীন, সরল নিষ্পাপ সৌন্দর্য্য তাহার তনুলতা ঘিরিয়া যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল। ভাবিতে-

ছিলাম এ বুঝি উর্ব্বশী, সুরনাথের অলঙ্ঘ্যশাপে মর্ত্ত্যের কুটীরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আমাকে বসিবার আসন দিয়া সে অদূরোপবিষ্ট অন্ধ বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'বাপজান, ভাইসাহেব আ গিয়া।' বৃদ্ধের শ্বেতশ্মশ্রু জরাজীর্ণ মুখমণ্ডল এই কথা শুনিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার দৃষ্টিহীন নয়ন দিয়া, মনে হইল, যেন অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছে। তাহার দেহের সকল শক্তি, অন্তরের সকল আবেগ যেন ঐ আকুল চোখ দুটীতে আসিয়া জমিয়াছে, চিরাকাঙ্ক্ষিতের দর্শন লাভ করিবার জন্য।

বৃদ্ধ হঠাৎ হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; যাহার জন্য জল ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার আঁখি অন্ধ হইয়া গিয়াছে, আজ যে সেই নয়ন-মণি ফিরিয়া আসিয়াছে, যাহার পদশব্দশ্রবণের জন্য সে নিয়ত ব্যগ্র থাকিত, সে হৃদয়ধন যে আজ তাহারই ক্রোড়ে উপস্থিত। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্তরের অশ্রুসাগরে বান আসিয়া তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমি অভাবনীয়ের পর অভাবনীয় দর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম, বৃদ্ধ একটু শান্ত হইলে তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন সে আমাকে আহ্বান করিয়াছে; উত্তরে সে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ:—তাহার মাতা অতি অল্পবয়সে কাবুলে মারা গেলে, পিতা গৃহহীন হইয়া শোকে স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহাকে ও তাহার প্রিয়দর্শন ভাইকে লইয়া কলিকাতায় ব্যবসায় করিতে আসে। দেশজাত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা

উপার্জ্জন হইত তাহাতেই এই ক্ষুদ্র পরিবারের বেশ চলিয়া যাইত। বৎসরের পর বৎসর এমনই সুখে ও নিরুপদ্রবে কাটিতেছিল, এমন সময় কাবুলের আমীরের সহিত সরকারবাহাদুরের যুদ্ধ বাধে। দেশভক্ত যুবক বৃদ্ধ পিতার অতুল স্নেহ, কনিষ্ঠভগ্নীর অকৃত্রিম ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদলে যোগদান করিতে আফগানিস্থানে চলিয়া যায়। তাহার পরে একদিন খবর আসিল সে রণক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণ দিয়াছে। তাহার পিতা পুত্রের বিচ্ছেদে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছিল; এই দুঃসংবাদে তাহার বোধশক্তি লোপ পাইল। তাহার ধারণা—পুত্র এখনো বাঁচিয়া আছে, এবং শীঘ্রই জয়গর্ব্বে মণ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরিবে। সংসারের সকল বোঝা পড়িল ঐ সুকুমার কিশোরীর উপরে; সে আরও সঙ্কটে পড়িল যেদিন তাহার পিতা অন্ধ হইয়া গেল।

দিন কয়েক হইল বৃদ্ধের এক বুলি হইয়াছে, যে এইবার তাহার পুত্র ফিরিয়া আসিতেছে। ভাল খাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে সাজসজ্জা ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার অনবরত এই চিন্তা হইয়াছে; আজ সকালে সে কন্যাকে বলিয়াছে যে পুত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসিয়া পঁহুছিবে।

কন্যা কি করিয়া যে উন্মাদ পিতাকে সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না—এমন সময় আমাকে দেখিয়া তাহার মনে হইল যে যথার্থই বুঝি তাহার ভাই ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিজের ভ্রম বুঝিতে যদিও তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হয় নাই, তথাপি আমার সহিত তাহার ভ্রাতার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া

সে বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ তখন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল—আমি ভাবিতেছিলাম কে এ পর্ব্বতবাসী কাবুলী তন্বী, যে তাহার করুণকাহিনীটী দিয়া আমার ভ্রাতৃহৃদয়ের সর্ব্বস্থল স্পর্শ করিয়াছে; আজকের পুণ্যপ্রাতে এই ব্যথাতুর বিয়োগাকুল পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, স্নেহময় ভ্রাতা ও পুত্রের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ বুঝি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম নিরুকে, সে অলক্ষ্যে আমার কোটের পকেটে বাজারের ফর্দ্দটি রাখিয়া মিলনকর্ত্রী হইয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িতেছিল—মাঝে মাঝে দেখা দিতে বার বার অনুরুদ্ধ ও প্রতিশ্রুত হইয়া একরাশি স্নেহযত্ন লাভ করিয়া অলস পদচারে ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া দেখি সুরেশ আমার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে ও নিরুপমা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ফোঁটা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সময় দেখি বই, তৈল কিছুই আনি নাই; ভগ্নী-প্রীতির মধু-ধারায় যে আমার চিত্ত আজ প্রথম অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহারই নিকটে অজ্ঞাতে আমার কল্যাণোপহার রাখিয়া আসিয়াছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
৮নং, আরপুলি লেন
কলিকাতা।

চতুর্থ পুরস্কার (গ)—৫৲ টাকা।

নিরুপমার জন্মকথা।

(রূপক)

(১)

তখন স্বর্গ অবরোধ করিয়াছিল দানবেরা। দীর্ঘ অবরোধের ফলে অমরার ঘরে ঘরে উঠিয়াছিল হাহাকার ; নন্দনের অনিন্দ্যনীয় শোভা হইয়া গিয়াছিল ম্লান ; সেথা ছিল না আর মন্দাকিনীর ধারে ধারে পুষ্পবীথিকার আশে পাশে দেব-বালাগণের কল হাস্য, অপ্সরার প্রাণমাতান নৃত্য, কিন্নরের মধুমাখা সঙ্গীত ;—চরিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল বিষাদের একটা কাল ছায়া।

দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করিবার জন্য বসিল দেবতাগণের সভা ;—আসিলেন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, কার্ত্তিকেয় আদি দেবগণ, তাঁহারা বহুক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, অভয়ার অভয়চরণে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

হিমানি মণ্ডিত চির তুষারাবৃত কৈলাসের পাদদেশে আসিয়া দেবতাগণ করজোড়ে আরম্ভ করিলেন স্তব ;—

ওঁ হ্রীংকারাং সত্বসারাং বিশুদ্ধাং
ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাম্।

তন্বীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং
বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ॥
লোকাতীতাং দৈত্যভূতাং
ভূতৈর্ভব্যাং ব্যাসশাতাতপাদ্যৈঃ।
বিদ্বদ্গীতাং কালকল্লোললোলাং
লীলাপাঙ্গক্ষিপ্তসংসারদুর্গাম্।" ইত্যাদি ইত্যাদি

দেবী স্তবে তুষ্টা হইলেন। দৈববাণী হইল,—"অচিরেই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

(২)

যে দিন চির বসন্ত বিরাজিত বৈজয়ন্তীধামের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়া জ্যোৎস্নাসেবিত নব কিশলয়পুঞ্জের অন্তরে শিহরণ জাগাইয়া বহিতেছিল মলয় বাতাস ; কামিনী কুঞ্জের আড়াল হইতে কুহরিতেছিল কোকিল, পারুলের ডাল হইতে ডাকিতেছিল পাপিয়া—বিরীহগণের চিত্ত ভরিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল কিসের একটা অতৃপ্ত বাসনা।

সুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে মণিমুক্তাখচিত পালঙ্কে আপনার উদাস অলস দেহকে ঢালিয়া দিয়া খোলা বাতায়নের পানে চাহিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়াছিলেন দানবরাজ। আজিকার এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছিল আর এক দিনের কথা। সে দিনও এম্‌নি চাঁদ হাসিয়াছিল ; এম্‌নি পাখী গাহিয়াছিল ; এম্‌নি ফুল ফুটিয়াছিল। আর দানবরাজোদ্যানের বকুলবীথির

তলে মর্ম্মরপাষাণনির্ম্মিত বেদিকার উপর দৈত্যরাণীর কোলে মাথা রাখিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন তিনি,—দৈত্যরাণি, আমাদের এ মিলনে বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই,—আছে কেবল মিলনের অনাবিল আনন্দ।" কিন্তু হায়! আজ দৈত্যরাণী কোথায় সেই দানবরাজ-অন্তঃপুরে, আর তিনি কোথায়—

সহসা একি? কোথা হইতে আসিল তাঁহার নাসারন্ধ্রে বিশ্বের পুঞ্জীভূত সুগন্ধ? সৌগন্ধের একটা প্রবল আকর্ষণ টানিয়া আনিল তাঁহাকে একটা হ্রদের তীরে। তথায় আসিয়া দেখিলেন তিনি যে হ্রদের মধ্যস্থলে ফুটিয়া রহিয়াছে একটী সহস্র দল পুষ্প। তাহার চারিপাশ বেড়িয়া গুণ্ গুণ্ করিতেছে লক্ষ লক্ষ ভ্রমর, 'মন-মাতান' সুবাসে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে; আর চিরন্তন শত্রুতা ভুলিয়া দেব-দানবগণ পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই অপূর্ব্ব সুবাস উপভোগ করিতেছেন।

সুবাসে উন্মত্ত হইয়া দানবরাজ ধনুকে শর যোজনা করিলেন পুষ্পটী কাটিয়া ফেলিবার জন্য। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রী করজোড়ে বলিলেন,—"এ আপনি কি করিতেছেন মহারাজ? পুষ্পটী কাটিয়া ফেলিলে এখনি যে সমস্ত দলগুলি ঝরিয়া পড়িবে। তখন কোথায় থাকিবে এর এই অতুলনীয় সুগন্ধ?"

মন্ত্রীর কথার উত্তরে দানবরাজ বলিলেন—"সত্যই ত। কিন্তু, এ সুগন্ধ কি চিরস্থায়ী করা যায় না?"

নিমেষে বিশাল জনসঙ্ঘ হইয়া গেল নীরব! বহুক্ষণ বাহির হইল না কাহারো মুখ দিয়া একটীও কথা; কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল তাঁহাদের হৃদয়ে দানবরাজের কথা কয়টী!

এই বিরাট্ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন—"এই পুষ্পের তৈল প্রস্তুত করিলে এ সুগন্ধি চিরস্থায়ী করা যায় দানবরাজ! এর প্রক্রিয়া জগতে একমাত্র আমি জ্ঞাত।"

আনন্দে চীৎকার করিয়া দানবরাজ বলিয়া উঠিলেন—"আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি দেবগুরু—যে দিন এই সুগন্ধি তৈল আমার হস্তগত হইবে, সেই দিনই আমি স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিব। ইহার বিন্দু মাত্র অন্যথা হইবে না জানিবেন।"

(৩)

পরদিন সুবৃহৎ চন্দ্রাতপতলে সমবেত হইলেন দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি স্বর্গবাসী। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র নিজ হস্তে উপহার দিলেন দানবরাজকে স্ফটিক-নির্ম্মিত তৈলের আধার। রত্ন-খচিত সিংহাসন হইতে সসম্ভ্রমে উঠিয়া গ্রহণ করিলেন দানব-রাজ সেই উপহার। তাহার পর গাঢ় আলিঙ্গনে ইন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলেন—"আজ আমায় যে বস্তু দান করিলেন দেবরাজ, তার কাছে স্বর্গের সমস্ত রত্নভাণ্ডার তুচ্ছ—সমগ্র বিশ্বে ইহার উপমা নাই।"

নিরুপমা-পুরস্কার।

এই কথায় সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"সত্যই বিশ্বে এ তৈলের উপমা নাই—আজ হইতে ইহার নামকরণ হউক—"নিরুপমা"।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলিকাতা।

চতুর্থ পুরস্কার (ঘ)—৫৲ টাকা।

রাবণের চিতা।

—:•:—

(১)

আমি যখনই শ্মশানপার্শ্ববর্ত্তী সেই পথটী দিয়ে কোথাও যাওয়া আসা করতুম, তখনই দেখ্‌তে পেতুম, সেই যুবকটী একই ভাবে সেই গাছটীর গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে সামনের নদীটির উচ্ছ্বসিত বারির পানে তাকিয়ে আছে। তার দীনভাবাপন্ন চেহারা দেখ্‌লে যথার্থই তার' পরে করুণা হয় বটে। তাকে প্রত্যেক দিন সেই একই স্থানে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গিছ্‌লো। কোনও দিন যে সে, সে জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে সে ধারণা আমি করি নি। এই একটি বছর আমি এসেছি এখানে বদলী হয়ে, এরমধ্যে একটি দিনও তাহাকে অন্য কোথাও দেখি নাই। সে যে কে, সে পরিচয় আমি জানি নি। কতদিন ইচ্ছে হয়েও ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছে ফলবতী হয় নি।

আরদালীটিকে আমি এখানে এসে পেয়েছিলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, সে ওই যুবকটিকে চেনে কিনা? কিন্তু সে

অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "আরে যানে দেও হাকিম সাব ও বাউরা হ্যায়। হাম উস্কো পয়ছান্তা নেহি।"

এত বড় একটি ডেপুটী হয়ে যে তার কাছে গিয়ে পরিচয় নেবো তাতেও কেমন সঙ্কোচ বাধতে লাগল। আরদালীকে বল্‌লুম "আস্‌ছে রবিবার ওকে আমার বাংলায় নিয়ে এসো।"

তার পরই যে রবিবার এলো, সে দিনে আমি সে লোকটার কথা একেবারেই ভুলে গিছ্‌লুম। আমি মাধ্যাহ্নিক আহার সেরে একটা ইজিচেয়ারে আড় হয়ে পড়ে ছিলুম,—বুকের উপর আধ খোলা পড়েছিল "আই-ভ্যান হো" খানা ;—বেশ তন্দ্রা আস্‌ছিল। বাতাসে মাথা হতে নিরুপমার সুমিষ্ট গন্ধ, সমস্ত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি কর্‌ছিল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হচ্ছিল, আমি যেন ইন্দ্রের নন্দন-কাননে এসে উপনীত হয়েছি।

ঠিক এমনই সময়ে চাপরাশীর কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারিত "হাকিম সাব" সম্বোধনে হঠাৎ নন্দন-কানন বিচ্যুত হয়ে আবার ধরাতলে এসে পড়লুম।

"হুজুর আফ্‌কা হুকুম তালিম হুয়া ; দেখিয়ে—"

সে সরে দাঁড়াতেই দেখ্‌লুম সেই লোকটিকে। চকিতে মনে পড়লো সেই দিনের কথা—যে দিন আরদালীকে আদেশ দিছ্‌লুম তাকে আমার বাংলায় উপস্থিত করতে।

আমি উঠে বস্‌লুম, বল্‌লুম—"এসো, ভিতরে এসো।"

সে দরজায় পা দিয়েই হঠাৎ চমকে পেছনে হটে গেল। আর কিছুতেই এগুলো না।

আমি তার ত্রস্ত ভাব দেখে বল্‌লুম "ঘরে এসো।" ভাবলুম, এই সুন্দর কার্পেট মোড়া ঘরে পা দিতে বুঝি সে সঙ্কুচিত হচ্ছে।

সে একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে "আমি এ ঘরে যাব না।" আমি মনে মনে হাস্‌লুম, যা—ভেবেছি তাই। বল্‌লুম "কেন আস্‌বে না? কার্পেট ময়লা হবে না, তুমি এসো।"

যুবক এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লে মাত্র। তার পরে আমার পানে তাকিয়ে বল্‌লে "কার্পেট ময়লা হবে বলে নয় মশায়। আমারও ঘরে এমন ঢের কার্পেট আছে—যা আমার চাকরেরাও ধূলাশুদ্ধ পায়ে মাড়িয়ে যায়। আমি যে যাচ্ছিনে তার একটা কথা আছে। আপনার ঘরে যে গন্ধ, আমি তা আদতে সহ্য করতে পারি নে।"

লোকটা বলে কি গো? লম্বা চওড়া কথা,—যেন কত বড় লোক। নিশ্চয়ই এ ঘোর পাগল। বল্‌লুম—"সে কি কথা, এতো বেশ মিষ্ট গন্ধ!"

বিমর্ষ মুখে সে বলিল "জানি মশায়, আপনার চেয়েও তা খুব বেশী জানি আমি। জেনেছি বলেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা! আজ আমি ধনে মানে জ্ঞানে বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হয়েও পথের ভিখারীর চেয়েও দীন।" বলে সে মাথায় হাত দিয়ে সেখানে বসে পড়লো।

আমি বাইরে এলুম—গন্ধটাও অবশ্য আমার সঙ্গেই বাইরে এল। সে অধৈর্য্য ভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিলে, আমি বল্‌লুম "তুমি এ রকম করছো কেন?"

"না মশায়, ওইটে পারি না বলেই আমি কোথাও যাইনে।

যেখানে যাবো সেইখানেই এই নিরুপমার গন্ধ। আমি কোথায় গিয়ে যে পরিত্রাণ পাবো তা ভেবে পাচ্ছিনে।"

সে মাথা নীচু করে বসে রইলো। তাকিয়ে দেখ্‌লুম তার নত বদন বয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। তার মুখে নিরুপমার নাম শুনে সকল বুঝতে পারলুম—এই নিরুপমার সঙ্গেই তার কোনও একটা স্মৃতি বিজড়িত।

আমায় নিস্তব্ধ থাকতে দেখে সে পকেট হতে খুব সন্তর্পণে একটা কাগজে মোড়া কি বার করলে। সেটা খুল্‌লে দেখ্‌লুম কতকগুলি ভাঙ্গা কাচখণ্ড।

যুবক উন্মত্ত ভাবে বার বার সে গুলিকে নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌লে "এই আমার জীবন মশায়, হাস্‌বেন না। এই উপলক্ষ করে আমি বেঁচে আছি। আমার কথা শুনুন, শুনলে সব বুঝতে পারবেন। বসুন এখানে।" আমি বিনা আসনেই তার পাশে বসে পড়লুম।

আজ ঠিক দেড় বছর,—এই সুদীর্ঘ দেড় বছর আমি এমনই উদ্দেশ্যহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি মশায়। একটি নিমেষের ভুলে আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি, জীবনে তা আর ফিরবে না!

আমি তখন কলেজে পড়ি। যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, তখন আমার বিয়ে হয়। আমার দুর্ভাগ্য, আমার স্ত্রীকে আমি আদতে দেখ্‌তে পারিতাম না। আমাদের বোর্ডিংয়ের পাশে একটী ব্রাহ্মপরিবার বাস কর্‌তেন,—আমি বেশী পছন্দ করেছিলুম তাদেরই বাড়ীর একটী মেয়ে,—ললিতাকে। আমার ইচ্ছে ছিল যাতে তার সঙ্গে আমার বিয়ে

হয়। আমার বাপ মা আমার মন বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একটী সুশীলা বালিকার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্‌লেন। আমার যত বিরাগ সব ভোগ করতে লাগলো সেই ক্ষুদ্রবালিকা 'শিউলি'। আমি যতই তারে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, সেও ততই মাধবীলতার মত আমায় আঁকড়ে ধর্‌তো। কখনও আমার একটী ভাল কথা সে পায় নি। হা, অভাগিনি! তুমি আজ কোথায়? একটী বার এসো—একটী বার শুধু আমায় চোখের দেখা দিয়ে যাও।

আমি ব্রাহ্মপরিবারে পূর্ব্বের মতই মিশতুম,—যেন আমি অবিবাহিত। বাড়ীতে আসবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, কেবল মায়ের জন্য মাঝে মাঝে আসতে হতো। বাবা বিয়ের পরই মারা গিছলেন।

সে বার যখন বাড়ী এলুম, তখন শিউলি বাপের বাড়ী ছিল। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম—কিন্তু দুদিন পরেই আপদ আবার ফিরে এলো। সেইদিনকার রাত, ওঃ, কি ভয়ানক!

আমি ইজি চেয়ারে শুয়ে বই পড়ছিলুম। শিউলি হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—নূতন তেল উঠেছে আমায় দুই শিশি আনিয়ে দেবে?

আমি গম্ভীর ভাবে বাইরে চোক রেখে বল্‌লুম—আমায় বিরক্ত করো না—যাও।

তার প্রফুল্ল মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আমার পায়ের কাছে বসে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে—তুমি স্বামী বলেই তোমায় বলতে আসি, তুমি না শুনলে কে শুনবে? আমি তোমার কি করেছি, যার জন্য আমায় তুমি দেখতে পার না?

আমি কর্কশভাবে বল্‌লুম—কি করেছ জান না? আমার উৎসাহময় জীবনটাকে নষ্ট করেছ তুমি। আজ দেড় বছরের মধ্যে আমার সুখশান্তি সব অন্তর্হিত করেছ; আমার কাছে বলতে এসেছ—লজ্জা করে না তোমার?

সে নত বদনে দাঁড়িয়ে রইলো, তার দু'চোক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আমার বড় রাগ হল,—ওঃ কি হৃদয়হীন তখন ছিলুম আমি। আমি বল্‌লুম—তুমি বেঁচে থাক্‌তে আমি সুখশান্তি পাব না। আমার কাছে আর এসো না;—যাও এ ঘর হতে, আমার মাথার ঠিক নেই এখন।

ক্ষীণকণ্ঠে সে বল্‌লে—কোথায় যাব?

সে আমার পায়ের কাছে বসে পড়্‌লো—আমি কিছু বলবার আগে আমার পা টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমার তখন এত রাগ হচ্ছিল যা বলবার নয়—আমি সজোরে পা ছাড়িয়ে বল্‌লুম—বেরোও ঘর হতে, নিয়ে যাও তোমার নিরুপমা তেলের শিশি।

শিশিটা রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। লক্ষ্য ঠিক ছিল না। সেটা সজোরে গিয়ে পড়লে ঠিক তার মাথার মাঝখানে। অমন যে শক্ত শিশি, সেও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হু হু করে প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটলো। গন্ধে সমস্ত ঘরখানা ভরে উঠলো।

তখন জ্ঞান ফিরে এলো,—এ কি করলুম? সে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে একবার মাত্র বল্‌লে—দোষ স্বীকার কোর না, চলে যাও এখনি, এখানে থাক্‌লে সব বলে ফেলবে—

সে ঢলে পড়ে গেল। আমি চীৎকার করে উঠতেই সকলে ছুটে এলো। সেই অবসরে আমি পলায়ন করলুম।

(২)

হায়! কোথায় শান্তি? পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু শান্তি কই? যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই অশান্তি যেন নিরুপমার সেই স্নিগ্ধ সুবাস,—আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভাসছে সেই রক্তস্রোত, আর সেই রক্ত মাঝে প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ মুখখানি।

ফিরিলাম—ট্রামে উঠে চল্‌লুম সার্কুলার রোডে। সেখানে নেমে বরাবর দাঁড়ালুম গিয়ে ললিতাদের বাড়ীর সামনে, দেখলুম বাড়ীটিকে বড় সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। গেটকিপার সবুজ রঙ্গের নূতন পোষাক পরে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে সে সসম্মানে অভিবাদন করলে।

শুনলুম আজ ললিতার বিয়ে। বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠলো। ললিতা,—সেই ললিতা, যে আমারই—একমাত্র আমারই ছিল,—সেও আজ পর হয়ে গেল। সে এখন অপরকে বরণ করতে যাচ্ছে! আর যে আমার আশ্রিতা,—যে জীবন মরণে একমাত্র আমারই, আমি তাকে হত্যা করে চলে এসেছি,—এই ললিতাকে দেখবার আশায়! ধিক্কারে আমার বুক ভরে উঠলো। সে কি আর আছে, হায় কোথা সে এখন?

সকলি ফুরালো স্বপন প্রায়
কোথা সে লুকালো,—কোথা সে হায়—

কোথা হতে এই দুটী লাইন গান আমার ঠোঁটে ভেসে এলো। নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণায় দুটী হাত বুকে চাপা দিয়ে আমি ছুটলুম ষ্টেশনে, যদি সে থাকে, তাই তার বাসনাতৃপ্তির জন্যে, তার মুখে একটু হাসি ফুটাবার জন্য ষ্টেশনের সামনে একটা দোকান থেকে দুটি নিরুপমা তেল কিনে নিয়ে চল্‌লুম।

ভগবান্! আর একটু, আর একটু, আমার চেতনা রাখ, আমায় জ্ঞানহারা আর করো না। যাকে কাঁদিয়ে রেখে এসেছি তার মুখের হাসিরেখাটুকু দেখ্‌বার অবসর দাও।

(৩)

বাড়ীতে যখন ফিরলুম, তখন বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ, দাসী চাকরেরাও এত সন্তর্পণে চলাফেরা করছে,—যা দেখলে বিস্ময় বোধ হয়। বেদনায় আমার হৃদয় টন্ টন্ করে উঠলো, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। মা আর পিসীমা দুজনে তখন বারেন্দায় বসে ছিলেন। আমায় দেখেই মা কেঁদে উঠলেন—হ্যাঁরে নরু, এমন করে কি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়? বৌকে না হয় নাই নিলি, তবু লোকে বল্‌বে তো সে তোর স্ত্রী। তোরও একটা কর্ত্তব্য বলে জিনিষ আছে তা জানিস্। জীবন কালে যা করিসনি—এখন মরণ কালে তার একবার তাই কর। দুটো কথা বল, যাতে তার প্রাণটা মরতে বসেও শান্তিতে যেতে পারে। এমন রত্ন চিন্‌লিনে রে হতভাগা। যথার্থই তুই বড় অভাগা—হাতের লক্ষ্মী

পায়ে ঠেল্‌লি। বিকারের ঝোঁকে কেবল তোকেই ডেকেছে। আজ একটু জ্ঞান হয়েছে, যা একবার, বেশীক্ষণ নয়, তার শেষ হয়ে এসেছে।

বজ্রের মত মায়ের কথাগুলি আমার কাণে এলো। আমি কম্পিত পদে ঘরে গেলুম। দেখ্‌লুম কি, আমার স্বর্ণপ্রতিমা আমারই নিদারুণ প্রহারে একেবারে বিছানায় লীন হয়ে আছে, পাশে বসে দাসী বাতাস দিচ্ছে। সে চোক মুদেছিল, পায়ের শব্দ কানে যাওয়া মাত্র বলে উঠ্‌লো "দেখ্‌তো তিনি এলেন বুঝি?"

আমি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলুম—হ্যাঁ ফিরে এসেছি আমি। সতী! তোমার পুণ্য বলে অধম স্বামীকে মহা পাতক হতে ফিরিয়ে এনে এখন মহাপ্রয়াণ করছো কোন্ দেশে?

কে, তুমি? আঃ,—সত্যই এসেছো তবে? বসো, বসো, আমার কাছে শেষ একবার বসো, একবার পায়ের ধূলো দাও।

আমি বস্‌লুম। সে আমার পানে তাকিয়ে বল্‌লে,—আমি যাচ্ছি, এবার তুমি সুখী হবেতো?

আমি বলে উঠলুম—না না তুমি যেও না, তুমি যেও না! আমি এখন অনুতপ্ত প্রাণে ফিরে এসেছি, আমায় গ্রহণ করো। তুমি কোথা যেতে চাও শিউলী, আমি যে মহাপাপ করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আজ আমি জগতের সামনে বলছি—আমি কারও নই, আমি তোমার, আমি তোমার, আমার শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান, গর্ব্ব, সব রসাতলে যাক, থাক কেবল একা তুমি। আমি স্বর্গ চাইনে

রাজ্য চাইনে,—চাই শুধু তোমায়। তুমি যা বলেছিলে, আমি তোমার জন্য সেই নিরুপমা এনেছি।

সে আমার পানে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে—যাক্ যাবার আগে তোমায় যে চোখে দেখ্‌লুম এই ঢের। নিরুপমার আর দরকার হবে না।

আমি চীৎকার করে মাকে ডাক্‌লুম। মা, পিসীমা, আমার বোন, সকলেই ছুটে এলো। আমি পাগলের মত মার পায়ে লুটিয়ে পড়লুম,—মা, ওকে তুমি বাঁচাও; আমার ক্ষমতা নেই। তুমি বই ওকে বাঁচাতে কেউ পারবে না।

বল্‌তে বল্‌তে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

(৪)

শিউলী শ্মশানে—আমি তার মৃত দেহ কোলে নিয়ে বসে। আমার ছোট ভাই প্রকাশ, বল্‌লে—বউদির জ্ঞান হলে শুনলুম, তিনি নীচে শুয়েছিলেন—হটাৎ টেবিল হতে শিশিটা কি রকমে পড়ে এমন ভাবে লেগেছে মাথায়—যে রক্ত আর কিছুতেই বন্ধ হোল না। ডাক্তার বলেছিল ভারী সিরিয়াস্ কেস্, বাঁচানো ভারী শক্ত হবে। আমরাও ভারী আশ্চর্য্য হচ্ছি—এমন ভাবে শিশিটা পড়লো কি করে?

আমার দুই চোখের ধারায় মৃতার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হয়ে গেল! তবু বল'নি সতী? মরেছো—সঙ্গে করে সে কথাটীকেও নিয়ে

গেছ। আর জগতের কেউ জানলে না, শুনলে না,—একবার তাকাও শিউলী, একবার চোখ তুলে চাও।

এই যে ক্ষত! ওঃ কি ভীষণ? এই যন্ত্রণা সহ্য করেছো? এই যে সেই নিরুপমার গন্ধ। যাও নিরুপমা, আজ আমার সতীর সঙ্গে তুমিও জন্মের মত অন্তর্হিত হও আমার সামনে থেকে। স্বর্গে গিয়ে আমার সতীকে স্নিগ্ধ কোরো।

আমার বুক হতে ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ তাকে চিতায় শুইয়ে দিলে। তার যত কিছু, আমি সব একে একে তার চিতায় সমর্পণ করলুম। ধূ ধূ করে চিতা জ্বলে উঠলো, আমার বুকের মধ্যেও সেই চিতা জ্বলতে লাগলো।

পুড়ে গেল—সব ছাই হয়ে গেল—সব গেল। সব দিলুম তার সাথে, দিলুম না কেবল তার ফটো, আর রক্ত মাখা সেই ভাঙ্গা শিশির টুকরোগুলি।

আমার বলতে যা কিছু ছিল সব ফুরিয়ে গেল। আমার বলতে বাকি রইলো আমি। এই শিশির টুকরোগুলি আমার সম্বল। আমি আত্মহত্যা করতুম—কিন্তু মর্‌লে পরে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আমায় বেঁচে থেকে এই জ্বালায় জ্বলতে হবে। তবে আমার যদি একটু প্রায়শ্চিত্ত হয়। আমি এখন মহাসমুদ্রের তীরে একা দাঁড়িয়ে, কেবল একটী ধাক্কা লাগার অপেক্ষা মাত্র।

যুবক নিস্তব্ধ হলো।

আমি এবার তার মুখের দিকে ভাল করে তাকালুম। এ

মুখ না আমার চেনা? এ যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড নরেনের মুখ। তবু সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

যুবক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—নরেন্দ্রনাথ বোস। চকিতে আমি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলুম—নরেন! নরেন! আমায় চিনতে পারছো না—আমি অতুল।"

নরেন একবার বিস্ময়ে আমার পানে চাইলে, বোধ হয় আমায় চিন্‌তে পার্‌লে। তার মুখ দিয়ে আর কথা বার হলো না। তার মাথাটা ঘুরে আমার কাঁধে পড়লো।

চকিতে মনে হলো আমরা দু জনে কি ভালবাসায় গ্রথিত ছিলুম। সেই সুশিক্ষিত ধনবান নরেন কি এই?

আমি সজল চোখে ডাক্‌লুম—নরেন!

নরেন ভগ্ন কণ্ঠে বলিল —অতুল?

আমি বল্‌লুম—এমন করে আর বেড়িও না। ঘরে যাও।

উন্মাদের মত হেসে সে বল্‌লে—ঘর আর নাই ভাই। এখন এই শ্মশান আমার ঘর—যেখানে তার চিতা জ্বলে ছিল। তার স্মৃতি আমি মুছতে পারবো না। আমার বুকের মাঝে জ্বলছে রাবণের চিতার মত তার ব্যর্থ প্রণয় রাশি।

শ্রীমতী প্রভাবতী সরস্বতী।
হরিদাস মাটি,
পোঃ বহরমপুর।

চতুর্থ পুরস্কার (ঙ)—৫৲ টাকা।

একটী গোলাপের কথা।

——:o:——

সে যে কতদিনের কথা, তাহা মনে নাই।

যে দিন বসন্তের একটি অম্লান মধুর সন্ধ্যায়, লাল আবীর ঢালা, লাল রবির মধুর লালিমায় রঞ্জিত হইয়া, মৃদু হিল্লোলিত, আকুলিত মলয় পবনের স্নিগ্ধ মদির পরশে বিকসিত, শিহরিত হৃদয়ে প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, সে কতদিনের কথা তাহা বলিতে পারি না, তবে সেদিনের সে বিষাদময় কাহিনীটী আমার এই ধূলিম্লান শুষ্ক হৃদয়ে আজও বড় গাঢ়, বড় মর্ম্মান্তিক ভাবেই জাগিয়া রহিয়াছে!

সে একটী কিশোরী, তন্বী, লাবণ্যময়ী রূপসী। আসন্ন যৌবনের মোহময় মধুর পরশে, সেই তরুণীর কোমল ঢল ঢল তরুণ দেহ-খানি যেন আমারই মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল!

আমি মুগ্ধ নয়নে তাহার পানে চাহিয়াছিলাম। সে আমার খুব কাছেই বসিয়াছিল। নবোদ্ভিন্ন কচি নধর দূর্ব্বাদলের সবুজ মখমলের উপর সে তার কুসুমপেলব অলস দেহখানি এলাইয়া দিয়া, বিশ্বের সৌন্দর্য্য মাখা বিষাদ-করুণ কচি মুখখানি তার মোমে

গড়া শুভ্র নিটোল হাত খানির উপর স্থাপিত করিয়া তখন আনমনে কি জানি কি ভাবিতেছিল।

ভাবের হিল্লোলে তা'র সেই দীর্ঘায়ত ভাসন্ত নয়ন দুটী মাঝে মাঝে অশ্রুজলে আকুল, আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল।

আহারে! এমন অনাবিল শুভ্র সৌন্দর্য্যের নিখুঁত ছবিখানি বিষাদের ম্লানছায়ায় ঢাকিয়া দিয়া কে এমন বিষণ্ণ করিয়া দিল?

বসন্তের আধ্‌ফোটা কোমল ফুলটুকুকে চিন্তার উত্তপ্ত দহনে ফেলিয়া এমন বিরস, বিমলিন করিয়া দিয়াছে, কে সে? ওগো! কেমন নিষ্ঠুর সে?

কিশোরী তাহার শুভ্র অঞ্চলপ্রান্তে সজল আঁখি দুটী মুছিতে মুছিতে বড় কাতর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

এমন সময় একটী কমনীয় কান্তশ্রী তরুণ যুবক ধীরে ধীরে আসিয়া কিশোরীর পাশে উপবেশন করিল। যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটিল! সেই যুগল রূপের মধুর ছবিখানি বক্ষে ধারণ করিয়া সেই পুষ্পপরিমলবাসিত, মৃদুমলয়ানিল সেবিত, কুসুমিত উপবন খানির সৌন্দর্য্য ও গৌরব যেন শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

তরুণীর ঈষদারক্ত ছল ছল চক্ষুদুটী, বিমর্ষ কাতর মুখশ্রী দেখিয়া যুবক ব্যথিত চিত্তে কহিল "আবার কাঁদ্‌ছিলে? কেন রেণু! মিছে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে তুমি আমার সংকল্পে—আমার কর্ত্তব্যে বাধা দিচ্ছ?"

রেণু তার অশ্রুভরা অবনত নয়নদ্বয় যুবকের পানে তুলিয়া

বেদনাক্ষুব্ধ হতাশ স্বরে কহিল "তবে তোমার সংকল্পই বজায় রহিল? যাওয়াই স্থির? কিন্তু তা'হলে আমার উপায় কি হ'বে অমর? বাবা কি এত দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিবেন?"

অমর সোৎসাহে উত্তর দিল, "হাঁ, পারিবেন রেণু, রেণু! তোমার পিতা দয়া করিয়া আমার আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমার যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তিনি তোমার বিবাহ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। এখন যদি এ যুদ্ধ যাত্রায় আমি তোমার পিতার কাম্য ধন মান যশ উপার্জ্জন করিয়া ফিরিতে পারি, তাহা হইলে—

অমর রেণুর সুন্দর কচি মুখখানি অনুরাগ ভরে দুই হাতে ধরিয়া উচ্ছ্বসিত প্রেমে কহিল, "তাহা হইলে এই অমূল্য রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদিন আমার জীবন জন্ম সার্থক করিব। আর যদি, যদিই রেণু—

যুবকের স্থির কণ্ঠস্বর ক্রমে কম্পিত ও রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রেণু তখন নিতান্ত ব্যথিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে তা'র ঈপ্সিতের পানে চাহিয়া বড় করুণ কাতর স্বরে বলিল "যদিই কি অমর?"

"যদিই এ যাত্রা আমার চির যাত্রা হয়, তখন রেণু! তুমি পিতার আজ্ঞা পালন করিতে অন্যথা করিও না।"

বেদনার আতিশয্যে, উপস্থিত হৃদয়াবেগে রেণু মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিল না, শুধু নীরবে এক খানি জীবন্ত বিষাদ প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা দুটী মুক্তার মত টল টল করিতে লাগিল।

হায়! প্রেমবিহ্বলা সরলা বালা! সে যে এ জগতে ধন মান যশ কিছুই চায় না, চায় শুধু তা'র বাঞ্ছিতের প্রেমময় বিশ্বস্ত হৃদয়ে এতটুকু নিশ্চিন্ত আশ্রয়লাভ করিতে!

কিন্তু ধনমানাকাঙ্ক্ষী পিতা তাঁহার সম্ভ্রান্ত বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া দুহিতার সেই ক্ষুদ্র কামনাটুকু পূর্ণ করিতে পারিবেন না।

অমর তাহার উদ্বেলিত চিন্তাবেগ কষ্টে সংযত করিয়া রেণুর নয়নজল সাদরে মুছাইয়া দিয়া ব্যথিত প্রেমাকুল কণ্ঠে কহিল "রেণু!—রেণু আমার! স্থির হও, দিনকতক ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে আবার মিলিব। তোমার ওই চাঁদমুখে মধুর হাসি ফুটাইয়া আমার জীবনের সাধনা, যৌবনের স্বপ্ন, সফল করিব। এখন আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও রেণু! কাল প্রাতেই যাত্রা করিব।"

অমর উঠিয়া দাঁড়াইল। রেণুও উঠিল। তখন কত কথাই বলিবার জন্য তাহার ফুলের পাপড়ীর মত কোমলারক্ত অধরপুটে কম্পিত, স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হায়! দুর্দ্দমনীয় লজ্জার শাসনে, সরমের রুদ্ধ ব্যাকুলতায় সে মুখে কত কথা ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না, মনের কথা, প্রাণের ব্যথা মনেই রহিয়া গেল!

রেণু তার ব্যথাভরা করুণ মৌন আঁখিদুটি তুলিয়া শুধু একবার বিদায়প্রার্থী অমরের পানে অতৃপ্ত, তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিল; সে দৃষ্টি যেন কত আগ্রহে, কত ব্যাকুলতায় সাধিয়া কাঁদিয়া বলিতে-

ছিল "একটু দাঁড়াও, ওগো বাঞ্ছিত, চির আরাধ্য আমার! আর একটুখানি দাঁড়াও, আমি সাধ মিটিয়ে, নয়ন ভরিয়ে, আর একটু খানি তোমায় দেখি!"

অমর যেন সে নীরব প্রেমের নীরব ভাষা বুঝিতে পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই ব্যথিতা বিহ্বলা বালিকাকে সান্ত্বনা দিবার উপায় আজ সে ভাবিয়া পাইল না।

তাহাদের সম্মুখেই ছিলাম আমি! আমার নবস্ফুট রূপের শোভায় আকৃষ্ট হইয়াই বুঝি অমর পরম আগ্রহে আমায় তুলিয়া লইল। তার পর রেণুর ভ্রমরকৃষ্ণ কুটিল কবরীতে আমায় সযত্নে স্থাপিত করিল। আঃ! সে কুন্তলে কি মধুর সুবাস!—সে প্রাণমাতান সৌরভের কাছে আমার ভুবনভুলান গোলাপী সৌরভের গৌরবও যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল!

পরে জানিয়াছিলাম সে সুগন্ধ গোলাপগন্ধী "নিরুপমা" কেশ তৈলের। সে বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকেও পরাস্ত করিয়াছে।

অমর অনুরাগ ভরে রেণুর হাত খানি ধরিয়া প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে কহিল "এই নাও রেণু! আমার স্মৃতিচিহ্ন! এই সুন্দর কোমল ফুলটী কালে শুকাইয়া গেলেও এ অভাগার কথা মাঝে মাঝে তোমায় স্মরণ করাইয়া দিবে।"

স্মৃতিচিহ্ন! এত দুঃখেও রেণুর অশ্রুসিক্ত মলিন মুখে বর্ষার মেঘ-ভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত একটুখানি ব্যথার চকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। কি? যাহার স্মৃতি সমস্ত চিত্ত ভরিয়া মনে প্রাণে জড়াইয়া মিশিয়া গিয়াছে তাহাকে মনে রাখিবার জন্য আবার স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন?

রেণু বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল "অমর তুমি বড় নিষ্ঠুর!"

রেণুর বেদনাবিধুর কোমল প্রাণে ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া অমর বড় লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া কহিল "ক্ষমা কর রেণু! আমার মনের এখন স্থিরতা নাই, তাই কি বলিতে তোমায় কি বলিতেছি। আমি জানি রেণু! তুমি একান্ত আমার, চিরদিন আমারই থাকিবে!"

তার পর সেই বিষাদময়ী প্রেমপ্রতিমাখানি আর একবার প্রেমাতুর তৃষিত নয়নে দেখিয়া লইয়া অমর বিদায় গ্রহণ করিল। সে সত্য সত্যই চলিয়া গেল!

সাঁঝের ঘনায়মান আঁধারে যতদূর দৃষ্টি চলে রেণু বিস্ফারিত ব্যাকুল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বেদনার উচ্ছ্বসিত আবেগে আমাকে তা'র উদ্বেলিত বেপমান বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া রেণু বাত্যাহত বাসন্তী ব্রততীর মত সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

তাহার উচ্ছ্বসিত অবাধ্য অশ্রুবিন্দুগুলি সেই সরল শ্যামতৃণদলের উপর হেমন্ত উষার স্বচ্ছ শুভ্র শিশির-কণার মতই ঝরঝরিয়া পড়িল।

হায় বিধাতঃ! নারীর কোমল প্রাণে এত প্রেম, এত মমতা দিয়া গড়িয়াছিলে শুধুই তাহাদের কাঁদাইবার জন্য?

* * *

সেই অবধি আমি রেণুর বিরহসন্তপ্ত কোমল বক্ষের মাঝে আশ্রয় লাভ করিয়াছি।

তার পর কত দিন কত রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা রাখিতে আমি অক্ষম। তবে এইটুকু বেশ বুঝিতেছিলাম দিনের পর দিন যতই যাইতেছে, সরলা আশামুগ্ধা রেণু তার আকাঙ্ক্ষিতের আসার আশায় হতাশ হইয়া যেন সায়াহ্ন নলিনীর মত মুদিতা ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িতেছিল।

সে আর হাসে না, কাহারও সহিত কথা কহে না, প্রাণের গোপন ব্যথা যখন বড় অসহ্য, উদ্বেল হইয়া উঠিত, তখন রেণু আমাকেই তা'র একমাত্র দুঃখের ভাগী ও ব্যথার ব্যথী মনে করিয়া গভীর প্রেমে, অধীর আবেগে আমায় বারম্বার চুম্বন করিত।

আমার নীরস বিশুষ্ক পাপ্‌ড়ীগুলি তা'র ধারাবাহী তপ্ত অশ্রু-জলে স্নাত হইয়া কতবার সিক্ত আর্দ্র হইয়া উঠিত।

আহা! তখন সেই দুঃখিনী মেয়েটীর জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কেমন করুণা জাগিত!

অভাগিনী তা'র নিরাশ আনন্দহীন ব্যাকুল হৃদয়ে একটুখানি সান্ত্বনা পাইবার জন্যই বুঝি যে স্থানে তা'র হৃদয়দেবতাকে শেষ বিদায় দিয়াছিল, সেই স্থানটীতে একাকী একখানি ম্লান ছায়ার মত বার বার মিছে ঘুরিয়া বেড়াইত!

প্রাণের অসহ্য গভীর বেদনা ক্ষণেক জুড়াইবার জন্য সে এক একবার কাঁপাগলায় মৃদু মধুর সুরে গুন্ গুন্ করিয়া কত দুঃখের গান গাহিত। তা'র একটী গান আজও আমার বেশ মনে পড়ে—

"সরমে মরমের কথা বলা হলো না!"

আহা! কি প্রাণ-উদাস-করা, মধুভরা করুণ সুর সেই—

"সখি! সরমে মরমের কথা বলা হলো না!"

আমরি মরি রে! সত্যই তো তাই!

সেই যে সেই বিদায় ক্ষণে, তরুণীর আশাদীপ্ত নবীন প্রাণটুকু ভরিয়া কত সাধ, কত কামনা নিমেষে জাগিয়া উঠিয়াছিল, মরমের নিভৃত কোণটীতে কত ব্যথা, কত কথাই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তার কোনটাই তো বলা হইল না, সমস্তই অব্যক্ত লুকান রহিয়া গেল!

তাই বুঝি রেণু ঐ গানটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যখন তখন গাহিত!

* * *

একদিন, ওহো! সেদিন কি কুক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল!

রেণু তখন তা'র নিভৃত ঘরটীতে, মুক্ত জানালার পানে মুখ করিয়া নিত্যকার মতই যেন কা'র প্রতীক্ষায়, কা'র আশাপথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় রেণুর পিতা আসিয়া ডাকিলেন—"রেণু!"

পিতার আহ্বানে সচকিত হইয়া রেণু ফিরিয়া দাঁড়াইল। পিতা কন্যার দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট হতাশ মুখখানি দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে স্নেহভরে কহিলেন "তুমি যে দিন দিন একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছ মা?"

রেণু কথা কহিল না, মাটীর দিকে মুখখানি নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রেণুকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার পিতা একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বাধ বাধ গলায় কহিলেন "রেণু! মা আমার। আজ

তোমায় একটি কথা বলিব, সেজন্য দুঃখিত হইও না। তুমি তো জানই মা! আমি শুধু অমরের উপরোধে পড়িয়াই এতদিন তোমার বিবাহ কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন—"

একটা অতর্কিত অমঙ্গল সম্ভাবনায় রেণুর আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। স্পন্দিতবক্ষের ভিতর বিষম তুফান বহিল। সে ভাঙ্গা গলায় অধীর ভাবে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি বাবা?"

"তুমি মনে ব্যথা পাইবে, তাই এতদিন বলি নাই মা! কিন্তু এখন আর লুকান চলে না। তুমি জান না, যুদ্ধস্থলে পৌঁছিবার অল্প দিন পরেই অভাগা অমর, শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছে। বিশ্বাস না হয় এই কাগজ খানি দেখিতে পার।"

রেণু বিবর্ণ পাংশু মুখে একখানি নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়িয়েছিল। পিতার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া রেণু ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল।

সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। রেণু, সোণার রেণু আর উঠিল না! সোণার রেণু, ধূলার রেণুতে মিশাইল।

সব ফুরাইয়াছে! প্রেমময়ী সরলা রেণুর অতৃপ্ত, অস্ফুটন্ত জীবনটুকু অকালে ঝরিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সে আদর সোহাগ সমস্তই নিঃশেষে ফুরাইয়া গেছে। এখন আছে শুধু স্মৃতি! এ জগতে সব যায়, স্মৃতি যায় না কেন?

আহা! বড় সাধ ছিল, যে চিতানলে আমার স্নেহময়ী রেণুর কুসুম-কোমল সুকুমার দেহখানি পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে সেই পবিত্র পুণ্য চিতাগ্নির মধ্যে এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র পুষ্প-জীবনটুকু আহুতি দিয়া অযাচিত প্রাণঢালা ভালবাসার একটুখানি প্রতিদান করি, কিন্তু নিষ্ঠুর পবন, রেণুর বক্ষচ্যুতি হইয়া পড়িবামাত্র আমাকে উড়াইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

সেই অবধি আমি এই মৃত্যু-বিভীষিকা শোকার্ত্তের হাহাকার পূর্ণ শ্মশান ভূমির একপার্শ্বে সেই স্বর্গলোকবাসিনী দেববালার বেদনাময় পবিত্র স্মৃতিটুকু বক্ষে ধরিয়া নীরবে একাকী পড়িয়া আছি।

এখন আমার আর কিছুই নাই, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, সাধ আহ্লাদ সবই চলিয়া গিয়াছে। নীরস শুষ্কদলগুলি পর্য্যন্ত কি জানি কখন ধূলায় মিশাইয়াছে। তবু পোড়া স্মৃতি যায় নাই। যতদিন না এই ক্ষুদ্র জীর্ণ হৃদয়খানি একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া এই শ্মশানের তপ্ত ধূলিকণায় মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, ততদিন এই বিষাদময়ী করুণ কাহিনী এই মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ স্মৃতির তীব্র বেদনা বুঝি ভুলিতে পারিব না।

এখন আমি নিঃসঙ্গ একাকী,—সুখহীন শান্তিহীন। শুধু শ্মশানের প্রাণ-উদাসকরা তপ্ত বায়ু, যেন আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আমার কাণের কাছে এক এক বার তার শোকের গান গাহিয়া যায়—"হা! হা! হা!"

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী।
আম্বালা।

চতুর্থ পুরস্কার (চ)—৫৲ টাকা।

বহ্বারম্ভে।

(১)

বেলা ঘরে ঢুকিয়া কাল কাল বড় বড় চোখের তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর উপরে বঙ্ককটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সুরেন তখন ঘাড় হেঁট করিয়া একখানা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল, পত্নীর সে কটাক্ষ-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল না। বেলা বড় যা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিল "কি কথা হচ্ছিল গা দিদি?" বড় গিন্নী দন্ত বিকাশ করিয়া চাপা গলায় একটু সভ্যতাব্যঞ্জক মধুর হাস্য করিয়া ইঙ্গিতের সুরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল "তোর নিন্দে,—আবার কি?" ঠাকুরপোর এও ত বড় অন্যায় বাপু, স্বামী হয়ে স্ত্রীর নিন্দা করা কি?" তাহার এই আত্মীয়তাজ্ঞাপক মোলায়েম রসিকতায় সুরেনকে যন্ত্রণাও দিল, শঙ্কিতও করিল। স্বামী স্ত্রীর কলহের মধ্যে অপর একজন আসিয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে দরদ জানাইয়া মধ্যস্থতা করিবে, ইহা একান্ত অসহ! সুরেন মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সে যাহা আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাও কার্য্যে পরিণত হইল। বেলা বড় যা'এর রহস্য বুঝিল না, মনে করিল সত্যই বুঝি স্বামী যা'এর কাছে তাহার নিন্দা করিতেছিলেন। তাই সে ক্রোধে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া কঠোর স্বরে বলিল

"তা কর্ব্বেনই ত! যেমন লোকের হাতে পড়েছি, আরো কপালে কি আছে!" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলিয়াই সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে দৃঢ় পদক্ষেপে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পত্নী আড়ালে যাহাই বলুক, আর সে আঘাত যত বড়ই হউক না কেন, সুরেন তাহা মুখ বুজিয়া সহিয়া লয়। কিন্তু আজ ভ্রাতৃজায়ার সম্মুখে স্ত্রীর এরূপ ব্যবহারে সে যেন লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। স্ত্রীর উপরে একটু অভিমানও হইল। হায়রে বাংলা দেশের অশিক্ষিতা পল্লী-বধূ! গুরুজনের সম্মান লঙ্ঘনের অপরাধ আশঙ্কা যাহার পদে পদে। মিথ্যা অন্যায় প্রমাণের জোরে, বিনা অপরাধে সহস্র দণ্ড ভোগ করিতে হইলেও নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। আর এই সহরের ভদ্র গৃহস্থ গৃহের সুশিক্ষিতা বধূ! মিথ্যা অভিযোগে, বিনা প্রমাণে অপরের সম্মুখে স্বামীকে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া অপমান করিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করিল না। পাছে সাম্‌নে বসিয়া থাকিলে বেলা আরও উত্তেজিত হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সুরেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাতের কাগজখানা টেবিলের উপরে ছুড়িয়া দিয়া নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

বেলার তখনও ক্রোধের শান্তি হয় নাই। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, ঘরে অপর কেহ নাই। তখন তাহার হৃদয়ের ব্যথা যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আবার পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া মনকে সান্ত্বনা দিল।

ছিঃ, সে কি চপলতা করিতেছে? সে এমন অল্পেই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে কেন?

বেলার রাগ হইলে হিতাহিত জ্ঞানরহিত হইত বটে, কিন্তু তাহার ক্রোধ অল্পেই যেমন আগুনের মত দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিত, তেমনি এক মুহূর্ত্তে তাহা নিবৃত্তি হইয়া অনুতাপে আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তরটা পূর্ণ হইয়া যাইত। আগুনে জল পড়িলে যেমন তার চিহ্নমাত্র থাকে না, তেমনি একটুখানি পরে বেলাকে দেখিলে আর বুঝিবার জো থাকিত না যে, এই একটু পূর্ব্বে সে এত রাগ করিয়াছিল!

কিন্তু সুরেনের প্রকৃতি ছিল ঠিক্ তার বিপরীত। সহজে তাহার রাগ হইত না, কিন্তু একবার কোন সূত্রে সে ক্রুদ্ধ হইলে তাহা সহজে যাইত না। তাহা হইলেও সহ্যশক্তিটা ছিল তার অতিরিক্ত। তাহার চোখের সম্মুখে যে যতই অন্যায় করুক না, এবং তাহাকে যত রূঢ় বাক্যই বলুক না কেন, সে মুখ বুজিয়া সহিয়া লইতে পারিত; কিন্তু এবারে হইয়াছিল কিছু বাড়াবাড়ি। ভ্রাতৃজায়ার সম্মুখে পত্নীর অসদ্ব্যবহারে সে মনে মনে চটিয়া উঠিল। তাই দুই তিন দিনের মধ্যেও পরস্পর কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না।

(২)

বাল-বিধবা পুত্রবধূর হস্তে সংসার-ভার চাপাইয়া দিয়া, শাশুড়ী যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তখন সুরবালার বয়স অল্প হইলেও সেই দিন হইতে এই ক্ষুদ্র সংসারে সে আপনার

একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। মাঝখানে হঠাৎ একদিন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বেলাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার বুকটা যেন মুসড়াইয়া পড়িল। তবুও ছোট বধূর মিঠা কড়া ব্যবহার তাকে তত দমাতে পারে নাই। বড় যা'এর কৃত্রিম ভালবাসাটা যে, তাহাকে নিতান্তই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নহে, তবুও কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য, সে লঙ্কার ঝাল যেমন খাইতে বিস্বাদ হইলেও সেটা নহিলে মানুষের চলে না, তেমনি সেও বড় যা'কে অনাবশ্যক জ্ঞান করিলেও সহিয়া, মানাইয়া চলিত। কারণ আপনার অক্ষমতাটুকু সে নিজে যেমন বুঝিত, তেমন অপরে বুঝিত না। এই লইয়াই পতি পত্নীর মধ্যে কারণে অকারণে প্রায়ই কলহ হইত।

পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত ভ্রাতৃজায়াটীকে সংসারে স্থান দিতে হইয়াছে শুধু পত্নীর অক্ষমতার জন্যই ত? নহিলে তাহাকে দেশের বাড়ীতে বিদায় করিয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী দুজনে নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। আর সেটা যে কত আরামদায়ক ও কত মধুর হইত তাহা সুরেন বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেও এ ক্ষেত্রে তাহার কথাটি বলিবার উপায় ছিল না। তাই ক্রোধের সময়ে পত্নীর ব্যবহারটা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিলেও রাগ পড়িয়া গেলে পত্নীর সরল মধুর ব্যবহারগুলি মনে পড়িয়া তাহার হৃদয়ে বেলার প্রতি একটু সহানুভূতি আসিয়া দেখা দিত। বেলা মাত্র বারো বৎসর বয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা যাহা কিছু সব এইখানেই ত? কিন্তু তাহাকে

সেরূপ সুশিক্ষা দান করিবার মত তাহার সংসারে লোক কই? সে নিজেও ত এ বিষয়ে কোনদিন এতটুকুও চেষ্টা করে নাই, কেবল রাগ অভিমান লইয়াই আছে। কিন্তু সেটা যে কাহার উপরে প্রয়োগ করিতেছে, এবং যাহার উপরে প্রযুক্ত হইতেছে, সে তাহার উপযুক্ত কিনা, একদিনও কি সে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে? অনর্থক এই বালিকা পত্নীর উপরে রাগ করিয়া সে নিজেও কষ্ট পাইতেছে, এবং বেলাকেও দুঃখ দিতেছে। আপনার ব্যবহারে সুরেন মনে মনে লজ্জিত হইল।

একই ইচ্ছা, একই বাসনা বুকে চাপিয়া তাহারা দূরে দূরে থাকিয়া আরও দুই একদিন কাটাইয়া দিল। ক্রমে ক্রোধের শান্তি হইবার পর একই ইচ্ছা দুইজনেরই মনে প্রবল ভাবে জাগিয়া থাকিলেও সুরেন আগেই ঘাড় নীচু করিয়া গর্ব্বিতা পত্নীর স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই সম্মত নয়। অন্তরে সেই কথাটা অহরহঃ জাগ্রত থাকিলেও চক্ষু-লজ্জার খাতিরে সে আপনার জেদটাকে বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। বেলাও পত্নীর অধিকারটুকু বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। একটু অভিমানের বেদনাও বুকে বাজিল। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে স্বামীরই সেটুকু আগে মিটিয়ে ফেলিবার যে, একটা চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, বেলা চেষ্টা করিয়াও সেটুকু ভুলিতে পারিতেছিল না। যদিও ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ সে কিছুই পায় নাই, তথাপি সে তাহার সখীজন-মহলে এমনিই ত শুনিয়াছে। কেবল তাহারই কপালের দোষে সবই উল্টা।

(৩)

রাত্রে একা ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়িয়া বেলা সেদিনের ঘটনাটা আগা গোড়া ভাবিয়া দেখিতেছিল। দিবসে কাজের হুড়াহুড়িতে সুস্থ হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবসর থাকে না। রাত্রে বিশ্রামের সময়ে যত কিছু চিন্তার বোঝা তাহার প্রাণটাকে যেন চাপিয়া ধরে। ক্রমে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া তাহার তন্দ্রা বোধ হইল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সে দুয়ারের দিকে কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল কেহ ডাকিতেছে কিনা। সুরেন আসিলে তাহাকেই ত দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে? বার বার ক্ষণিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া, শেষবার তাহার তন্দ্রাটা বেশী আলস্য ও কাতরতার বোঝা লইয়া চোখের উপরে ভারী হইয়া বসিল। ভিতরের উদ্বেগ চাঞ্চল্যটাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চমকিয়া ধড়ফড় করিয়া সে বিছানাতে উঠিয়া বসিল। কাণ পাতিয়া শুনিল সত্যই সুরেন ডাকিতেছে। "লছমন, ও লছমন, শূয়ার কাঁহাকা।" তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিয়া বাতীটা হাতে লইয়া দ্বার খুলিয়া বেলা বাহিরে আসিল।

বড় বা'এর ঘরের সামনে আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "দিদি জেগে আছ কি?" সুরবালা জাগিয়াছিল, বিরক্ত স্বরে উত্তর দিল "কেন?" লজ্জিত হইয়া বেলা বলিল "কিছু নয়, জেগে আছ কি না সাড়া নিচ্ছি।" সুরবালা ভিতর হইতে কি উত্তর দিল ভাল শুনা গেল না। বেলা দ্রুতপদে বাহিরের দ্বারের কাছে

আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সুরেন ভিতরে ঢুকিয়া তীব্র অনুসন্ধিৎসু কটাক্ষে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া বোধ হয় একটা কিছু খুঁজিবার চেষ্টা করিল। বেলা লজ্জিত হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন দ্বার বন্ধ করিয়া বিনা বাক্যে শয়ন-কক্ষের দিকে চলিয়া গেল। বেলা মাথার কাপড়টা একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া বাতী হস্তে তাহার পিছু পিছু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুরেন তাহাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া, ছড়িটা যথাস্থানে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, হঠাৎ বেলার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে খাবার জল আছে ত?" বেলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "আছে।" সুরেন মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে কহিল "এক গেলাস দিতে পারবে?" সুরেনের বিনীত স্বরটা বেলাকে বিপরীত ভাবে আঘাত করিল।

(৪)

এতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরিপূর্ণ হাস্য কৌতুক গীত বাদ্য চলিবার পর, সুরেনের উল্লাসিত প্রাণটা আরও একটু আরামদায়ক একটা কিছু পাইবার আশা করিতেছিল। সম্মুখে সে সুযোগটা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ঘুমটাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার মত সুখান্বেষী মানুষের প্রকৃতিতে মোটেই সম্ভব নহে। তার উপর নিতান্ত নিরীহের মত বেলাকে শয্যা আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহার মনটা অশান্তিতে ভরিয়া গেল। বিনয়ের স্বরে কহিল "মাপ্ কর বেলা, মানুষ মাত্রেরই ভুল চুক্ হয়ে থাকে, সরে এসে ভাল করে শোও।" বেলা তেমনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া

শুইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। সুরেন আবার কহিল "শুনচো? সরে এস, একটা ত্রুটি কি চিরদিন মনে রাখ্‌তে হয়?" বেলা বালিশে মুখ গুঁজিয়া উত্তর দিল "হয় বৈ কি! মর্ম্মান্তিক যা কিছু মানুষের মনে তা চিরদিন জেগে থাকে।" তাহাকে কথা বলিতে দেখিয়া সুরেনের মনে অনেকটা আশা হইল। সে চক্ষের নিমিষে উঠিয়া আলমারী হইতে নিরুপমা তৈলের শিশিটা পাড়িয়া খানিকটা তেল হাতে ঢালিয়া আনিয়া ত্বরিত হস্তে বেলার মাথায় মাখাইয়া দিল। এবং সজোরে তাহার মস্তকটা টানিয়া তুলিয়া আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। বেলা জোর করিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রুদ্ধস্বরে বলিল "এই রাত দুপুরে মাথায় খানিকটা তেল ঢেলে দিলে যে?" মৃদু হাসিয়া রহস্যের স্বরে সুরেন কহিল "মাথাটা বেজায় গরম হয়েছে কিনা! এখন ঠাণ্ডা হও।" বেলা আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল "এমনি করে মানুষকে জব্দ করতে হয় বুঝি? অর্থসূচক কটাক্ষ হানিয়া সুরেন বলিল "হুঁ এখন বোঝ!" সে কটাক্ষের মর্ম্ম বেলা কি বুঝিল, এবং তাহার মনের অবস্থা যে কি হইল, তাহা অন্তর্য্যামী জানেন. মুখের হাসি চাপিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "আমি বুঝতেও চাইনে, যার সখ হয় সে বুঝুক! এখন ছাড়, ঘুম পেয়েছে।" সুরেন জোর করিয়া আবার তাহার মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া মৃদু চুম্বন করিয়া কহিল, "নাও হার মানলুম, সখটা ষোল আনা আমারই! এখন আমাকে মাপ্ করলে কি না বল? আড়চোখে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বেলা হাসিয়া ফেলিল।

দু'জনেরই নয়নে প্রীতিবহ পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সাগ্রহে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সুরেন গাঢ় স্বরে বলিল "বড় সয়তানী করেছ, এমনি রাগই কি করতে হয়?" মৃদু হাসিয়া বেলা স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কহিল "হয় বৈকি—নইলে এত আদর কি পাওয়া যায়।" সুরেন আবার হাসিয়া উঠিল, তারপর স্বামীর সমস্ত আপত্তি মাথামুণ্ড যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়া বেলা পরম বিজ্ঞতার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি এক ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করে, তবে স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে দশ ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে স্বামীর রাগ করা নিতান্তই অন্যায়। কথাটার অযৌক্তিকতা লইয়া তর্ক করিতে গেলে, অফুরন্ত তর্ক চলিবে, এবং হয় ত এই আসন্ন সন্ধির মাঝখানে আবার নূতন বিচ্ছেদের আয়োজনও প্রস্তুত হইবে, ভাবিয়া বুদ্ধিমান্ সুরেন কোমল ব্যবহারে ব্যাপারটা শোধরাইয়া লইয়া সদুপায়ে বেলার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। সলজ্জ হাস্যে মুখ সরাইয়া লইয়া বেলা বলিল "আচ্ছা নাও, রাত ঢের হয়েছে, এখন ভদ্র লোকটীর মত শুয়ে ঘুমোও দিকি!" পত্নীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, সকৌতুক নয়নে সুরেন বলিল "পারিশ্রমিক।" কপটকোপে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বেলা কহিল, "আহা, কি কথাই শিখেছ!"

শ্রীমতী শরদিন্দু সরকার।
পুরুলিয়া।

চতুর্থ পুরস্কার (ছ)—৫৲ টাকা।

ছদ্মবেশী।

—০:✱:০—

(১)

আজকাল বাঙ্গালার গল্প-সাহিত্য দীনেশ বাবুর খুব নাম। তাঁহার গল্পের আলোচনা গৃহে গৃহে হইয়া থাকে, অনেকেই বলিয়া থাকেন, প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী রচনায় তাঁহার জোড়া নাকি বাঙ্গালায় নাই।

সেদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম তারিণীকুমার মিত্রের হ্যারিসন রোডস্থ বিশাল ভবনে তিনটী প্রাপ্তযৌবনা বালিকা দীনেশ বাবুর গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের একজন তারিণী বাবুর একমাত্র কন্যা অনিলা, অপরা দুইজন তাহার আত্মীয়া বিমলা ও মণিমালা।

অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী নানা আলোচনার পর মণিমালা বলিয়া উঠিল,—"দ্যাখ ভাই, আমার বিশ্বাস দীনেশ বাবু বোধ হয় কাকেও ভাল বেসে ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিদান পান্‌নি।"

মণিমালার কথায় মৃদু হাসিয়া বিমলা বলিল,—"একথা কি করে তুই জানলি ?"—

"দীনেশ বাবু নিজের লেখায় নিজেই ধরা পড়েছেন। যেখানে তিনি হতাশপ্রেম সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন, সেখানেই এমন প্রাণ ঢেলে লেখা হয়েচে, যে, নিজের অনুভূতি না থাকলে কেউ-ই সে রকম লিখ্‌তে পারে না।"

মণিমালার কথা শুনিয়া বিমলা বলিল,—"তোর সকল তা'তেই যেন কিছু বাড়াবাড়ি। নিজের অনুভূতি না থাক্‌লেই যে কিছু লেখা যায় না, এমনই কি কথা আছে ? হয় তো লেখক প্রবীণ লোক ; জীবনে অনেক দেখেছেন শুনেচেন, আর তারই অভিজ্ঞতায়—"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মণিমালা বলিয়া উঠিল—"ঠিক তার বিপরীত। সরস্বতী সম্পাদকের সঙ্গে আমার মেজ'দার আলাপ আছে। সেদিন তিনি নিজে সরস্বতী আপিসে দেখে এসেচেন যে দীনেশ বাবুর বয়স পঁচিশের বেশী নয়।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল—"মেজদার মুখে শুনিচি দীনেশ বাবুকে দেখ্‌লে বোধ হয়, তিনি যেন জীবনের শান্তি চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলেচেন। এখন বুঝ্‌লে, কেন আমি ব'লছিলুম, দীনেশ বাবু ভালবেসে প্রতিদান পান্‌নি ?"

এই কথার উত্তরে কেহ আর কিছু বলিল না ; সুতরাং সে দিনের মত এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ রহিল।

(২)

মেঘমালাময় মেদুর গগনের তলে সে দিন বর্ষা নামিয়া আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে চপলাসুন্দরী চোখ দিয়া বিদ্যুতের ঝিনিক

হানিয়া আবার মেঘের কোলে গিয়া লুকাইতেছিল। চাতকীদের আজ আনন্দের সীমা ছিল না। তাহারা গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়া গিয়া চপলার এই লুকোচুরি খেলা দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

খোলা বাতায়নের ধারে বসিয়া বিমলা ও অনিলা একমনে বর্ষারাণীর এই প্রাণমাতান শোভা দেখিতেছিল, বর্ষাসিক্ত বায়ু রাস্তার ধারের একটা কদম্ব বৃক্ষ হইতে সুগন্ধ বহিয়া আসিয়া তাহাদের গায়ে মাথায় বুলাইয়া দিতেছিল, এমন সময় একখানা সরস্বতী পত্রিকা হস্তে লইয়া মণিমালা সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পদশব্দে অনিলা ফিরিয়া চাহিতেই মণিমালা বলিল—"এই ছাখো, সে দিন আমি যা" বলেছিলুম তা'র আর একটা প্রমাণ।" বলিয়া "সরস্বতী"খানি বিমলার হস্তে দিল।

"এ সংখ্যায় দীনেশ বাবুর একটী নূতন গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ ;—

একজন নগণ্য যুবক একটী ধনীর দুহিতাকে মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে ; ভালবাসার প্রতিদান চাহে নাই। চাহিয়াছে কেবল হৃদয় ভরিয়া দেখিতে ; সংকল্প করিয়াছে, চিরজীবন হৃদয়-লক্ষ্মীর ধ্যানেই কাটাইয়া দিবে। ইহার বেশী সে আশা করে নাই। আর তাহা করাও যে তাহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র।

এই ঘটনাটিকে তিনি এম্‌নি ভাষা দিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে গল্পের নায়কের প্রতি স্বতঃই একটা সমবেদনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বিমলা গল্পটি অনিলাকে পড়িয়া শুনাইয়া বলিল—"সত্যিই

ভাই, দীনেশবাবু কাউকে ভালবেসেছিলেন, মণিমালার এই কথা যদি সত্যি হয়, তা'হলে যাকে বেসেছিলেন সে নিশ্চয়ই পাষাণী, তা' না হ'লে, দীনেশ বাবুর এমন ভালবাসা—একি, অনিলা তুই কাঁদচিস্ ?"

সত্যই অনিলা কাঁদিতেছিল। যেদিন হইতে সে শুনিয়াছিল যে দীনেশ বাবু ভালবাসিয়া প্রতিদান পান নাই, সেই দিন হইতে তাঁহার প্রতি করুণায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর যতই সে এই বিষয় ভাবিয়াছে ততই কি জানি কেন কিসের একটা অজ্ঞাত বেদনায় তাহার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। এক একবার সে কল্পনানয়নে দীনেশ বাবুর বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি অঙ্কিত করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। নিজের এই মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য কতবার সে আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে ; দীনেশবাবুর কথা ভাবিব না বলিয়া দৃঢ়পণ করিয়াছে ; কিন্তু কিছুতেই সে নিজের বিদ্রোহী মনকে সংযত করিতে পারে নাই।

আজও সে দীনেশ বাবুর গল্প শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের সহিত দগ্ধ হইতেছিল। কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে পরাজয় স্বীকার করে নাই। কিন্তু যখন সে বিমলার মন্তব্য শুনিল—"সত্যই সে পাষাণী" তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না—ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমলার কাছে এতদিন যাহা আবছায়ার মত ছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইদানীং কেন যে অনিলা নানা অছিলায় দীনেশ বাবুর প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিত, সে প্রসঙ্গ উঠিলে কেন আবার

হঠাৎ নীরব হইয়া যাইত তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বলিল, —"মরেছিস, দীনেশ বাবুকে বুঝি—"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় চটি জুতার শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল, অনিলাদের বাজার সরকার হরিহর সম্মুখের বারান্দার দিকে আসিতেছে তাহার আর কথা শেষ করা হইল না।

(৩)

সে দিনের অলস মন্থর মধ্যাহ্নটা কিছুতেই কাটিতেছিল না, তারিণীবাবু একখানি আরাম কেদারায় শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যর্থ চেষ্টার পর ভাল না লাগায় ধীরে ধীরে অনিলার কক্ষের দিকে চলিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন অনিলা জানালার ধারে একটা সেলাই হাতে করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি সেলাইয়ের দিকে নিবদ্ধ নাই, তাহা জানালার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া অসীম আকাশের অনন্ত কোলে গিয়া হারাইয়া গিয়াছে।

মাতৃহীন কন্যার আজিকার এই নিঃসঙ্গ অবস্থাটা তারিণী বাবুর স্নেহান্ধ পিতৃহৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল, আজ যদি অনিলার মাতা জীবিতা থাকিতেন, তাহা হইলে কি অনিলাকে সঙ্গিনীর অভাবে এম্‌নি করিয়াই সময় কাটাইতে হইত? এই কথা ভাবিয়া তাঁহার চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"বিমলারা বুঝি আজ কেউ আসিনি মা অনু?"

তাহার পর তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাইয়া বালকের ন্যায় আব্দার করিয়া বলিলেন—"সেদিন যে বইটা পড়তে পড়তে রেখে দিয়েছ, সেটা আজ শেষ করে ফেল' ত মা। বইটি আমার খুব ভাল লেগেচে।" এই বলিয়া অনিলা কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিনি লাইব্রেরীর চাবিটা কন্যার হাতে দিলেন।

(৪)

উপর হইতে লাইব্রেরীর গৃহে যাইবার পথের ধারেই ছিল বাজার সরকার হরিহরের থাকিবার ঘর। আজ লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া ফিরিবার সময় অনিলা হরিহরের ঘরের সম্মুখে একখানি সুন্দর বাঁধান খাতা কুড়াইয়া পাইল। খাতাখানির প্রথম পাতা খুলিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার গণ্ডদ্বয় আপনা আপনি আরক্তিম হইয়া উঠিল। বই লইয়া যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া সে তাড়াতাড়ি হরিহরের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সে জানিত, হরিহর এ সময়ে ঘরে থাকে না।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অনিলা আর একবার ভাল করিয়া খাতা-খানি দেখিল সত্য সত্যই লেখা রহিয়াছে, "আমার ডায়েরী, শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু বি-এ।" সে তখন ডায়েরীর পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল:—

২০শে আষাঢ়।

বি-এ পরীক্ষার ফল বের হ'বার দুদিন পরে হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল জগদীশ বাবু ইহলোক ত্যাগ করলেন, আর তাহার উপযুক্ত পুত্র কিরণবাবু আমায় স্পষ্ট

ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, এখন হ'তে আর তাঁহাদের গৃহে আমার স্থান হইবে না, তখন পিতৃমাতৃহীন হতভাগ্য আমি চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম। কিন্তু ভগবান্ আমার উপর সদয় হ'লেন, সেদিন বেঙ্গলী পড়তে পড়তে একটা বিজ্ঞাপন দেখ্‌লুম, কলিকাতার তারিণীকুমার মিত্রের একজন বাজার সরকার দরকার, মাহিনা ২০৲ টাকা, তাছাড়া খাওয়া পরা আর থাকবার জায়গা শুদ্ধ পাওয়া যা'বে। মনে একটা ফন্দি খাটিয়ে হরিহর সরকার এই ছদ্মনামে আবেদন লিখে পাঠালুম। পরের ডাকে খবর পেলুম আমার চাকরী হয়েছে। সেই দিনই রাত্রে আমার নিজের টাকা কড়ি যা' কিছু ছিল নিয়ে কলিকাতায় যাত্রা করলুম।

* * * * *

আজ ইউনিভারসিটি কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে এলুম। অবশ্য কথাটা এঁদের কাছে প্রকাশ করলুম না—আর তার দরকারও ছিল না। কেন না, এতদিন ধরে দেখে আস্‌ছি যে, বেলা ১২টা থেকে প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত আমি কি করে কাটাই তার খোঁজও এরা রাখেন না। তবুও সাবধানের বিনাশ নাই। এই ভেবে কাছাকাছি একটা খোলার ঘর ভাড়া করলুম—পড়াশুনা তাতেই চলবে।

রবিবার—কলেজে বের হইনি। দুপুর বেলা চুপ করে আমার ঘরটীতে বসেছিলুম। এমন সময় একটী ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে আমার ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। উঃ কি রূপ! আমার বোধ হ'ল রূপের জ্যোতিতে যেন জায়গাটা

আলো হ'য়ে গেছে। চোখ ফেরাতে পারলুম না, অনেকক্ষণ ধ'রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই মেয়েটী তার চোখ দু'টী নামিয়ে নিলে। তারপর ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, "ইনিই বুঝি গোপাল বাবুর বদলে এসেচেন?" ঝি বল্‌লে—হাঁ। * * * কতক্ষণ হ'ল সে মেয়েটি চলে গেছে, কিন্তু ঘুরে ফিরে তার কথাই বার বার আমার মনে পড়চে। এ আবার আমার কি হ'লো? যাক্ সে কথা, শুনলুম মেয়েটির নাম অনিলা, তারিণী বাবুরই মেয়ে।

* * * * *

সকালের কাজ কর্ম্ম সেরে সেই সবে স্নান করে কাপড় ছাড়ছি এমন সময় অনিলা এসে আমার হাতে একটি থালা এনে দিলে। তাতে গোটাকতক সন্দেশ, কয়েকটা ফল আর একশিশি নিরুপমা তেল ছিল। আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইতেই সে অল্প হেসে ব'ললে—"আজ আমার জন্মদিন হরিহর বাবু। এগুলি আমার জন্মোৎসবের প্রীতি-উপহার। বাবা প্রতি বৎসরই আমার জন্মদিনে সকলকেই এইরকম কিছু কিছু দিয়ে থাকেন। এতে 'কিন্তু' হ'বার কিছু নেই—বাবা নিজেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" এই বলে সে চলে গেল। যতক্ষণ একে দেখা গেল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলুম। এতদিন যে জিনিসটা আমার হৃদয়ের এককোণে সভয়ে উঁকিমারবার চেষ্টা ক'রছিল, আজকের এই সামান্য ঘটনায় সেটা উন্মত্ত নদীর মত সমস্ত হৃদয় প্লাবিত ক'রে ফেল্‌লে। হৃদয়ের আবেগ চাপ্‌তে

না পেরে তার দেওয়া নিরুপমার শিশিটা বুকের মাঝে চেপে ধ'রলুম।

* * * *

সেই তেল দেওয়ার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বেদনা আমার মনের ওপর জমাট বেঁধে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারচে, তারই কিছু কিছু ভাব নিয়ে মাসিক পত্রিকায় আমি দু' তিনটী গল্প লিখেছিলুম। একখানা কাগজে তার সমালোচনা বেরিয়েচে দেখ্‌লুম। তাঁরা আমার খুবই প্রশংসা ক'রেছেন। কিন্তু হায়! যা'র কণামাত্র প্রশংসা পেলে আমি নিজকে ধন্য মনে ক'রতুম, তার হৃদয়ে কি আমার গল্প একটুও আঘাত কর্‌তে পেরেচে!

* * * *

ইহার পর অনিলা যতই ডায়েরীর পাতা উল্টাইতে লাগিল ততই দেখিতে পাইল, অপূর্ব্ব বেদনার হতাশার করুণ সুর প্রতি ছত্রে-ছত্রে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু একটি স্থান সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, সেই স্থানে লেখাছিল;

—"সমস্ত বাঙ্গালা আজ শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে আমার পূজা ক'রচে। কিন্তু যার একটু হাসিতে আমার জীবন ধন্য হয়ে উঠত—তাঁর প্রাণে কি আমার সাহিত্য-সম্মান কোন প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পারে নি? সে কি এ দীন ভক্তের পানে ফিরেও তাকাবে না? তার প্রাণ কি পাষাণ দিয়া গড়া? না না, তা' নয়, তবে কি

আমার পূজা তাকে তুষ্ট করতে পারেনি? কি দিয়ে পূজা কর্‌লে তুমি তুষ্টা হও দেবী আমার! সাধনা আমার?

অনিলা আর পড়িতে পারিল না। ডায়েরীখানি বক্ষে চাপিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল; প্রাণের ভিতর থেকে একটা রুদ্ধস্বর যেন বলে উঠল্—"ওগো, হৃদয়দেবতা! তুমি কেবল আমায় নিষ্ঠুর বলেই ভেবেছ, কিন্তু আমি যে কত আগেই মন প্রাণ তোমার চরণে বিলিয়ে দিয়েছি—"

ঠিক্ এইসময় হরিহর ওরফে দীনেশ বাবু তাহার হারাণ ডায়েরী খুঁজিবার জন্য সেইখানে আসিলেন। মেঝের উপর তাঁহারই হারাণ' ডায়েরীখানি বক্ষে চাপিয়া অনিলা বলিতেছে—"ওগো হৃদয়-দেবতা, তুমি কেবল আমায় নিষ্ঠুর ব'লেই ভেবেছ—কিন্তু ওগো, আমি যে কত আগেই মনপ্রাণ তোমার চরণে বিলিয়ে দিয়েছি—"

ছদ্মবেশী আজ ধরা পড়িল। শুনা যায় পরে নাকি বাঁধাও পড়িয়াছিল।

শ্রীদুলালচন্দ্র প্রামাণিক।
নেবুতলা, কলিকাতা।